মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্য

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড: আয়শা বেগম

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401829

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

উপস্থাপক

মাহফুজা আইউব

এম. ফিল. গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

401829

M.

401829

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞান পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, মাহফুজা আইউব ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে **"মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্য"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছে। মৌলিক উপকরণের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এ অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল। আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যপ্রান্ত পাঠ করেছি এবং এটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

401829

আয়শা বেগম
১৫ - ১ - ২০০৪
(ডঃ আয়শা বেগম)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্য শিরোনামের এ গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ বিষয়ের উপর অন্য কেউ অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকার্য পরিচালিত হয় নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য লিখিত এবং এটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নি।

মাহফুজা আইউব

এম. ফিল. গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

401829

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্য" শিরোনামের গবেষণা কর্ম সম্পাদনে আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অনেকের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। যাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ব্যতীত আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে পারতাম না তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এ প্রসংগে প্রথমেই যাঁকে স্মরণ করতে হয় তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আয়শা বেগম। তিনি তাঁর অনেক কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও উক্ত এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের পরিকল্পনা, অধ্যায় বিভাজন, উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ, অভিসন্দর্ভের বিন্যাস এবং সার্বিকভাবে বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাসত্ত্বেও আলোচ্য গবেষণা কর্মে যদি কোন দোষ-ত্রুটি থাকে তা একান্তই আমার নিজস্ব দুর্বলতা। গবেষক হিসেবে আমি আমার এই বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় সভাপতি, অভিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমার কাজ কর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং দ্রুত অভিসন্দর্ভ সম্পাদনের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

উক্ত গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা জাদুঘরের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। এইসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বিক্রমপুরের ইতিহাস সংক্রান্ত দুস্প্রাপ্য বই পড়ার সুযোগ দিয়ে জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরের প্রধান গ্রন্থগারিক কঙ্কনকান্তি বড়ুয়া এবং তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা এই অভিসন্দর্ভ রচনায় পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত জনাব আবু মুসার মুন্সিগঞ্জের জরিপ প্রতিবেদন আমার গবেষণা কর্মে যথেষ্ঠ সহায়তা করেছে। এছাড়া এই বিভাগের অঙ্কণ শাখার জনাব আব্দুস সবুর এবং আলোকচিত্র শিল্পী জনাব তৌহিদুন্নবী যিনি বিক্রমপুরের কয়েকটি স্থাপত্য নিদর্শনের ছবি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। জনাব আব্দুস সবুর মুন্সিগঞ্জের স্থাপত্যের ভূমিনকশা অঙ্কণে সহায়তা করেছেন। মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বেশ কয়েকবার মুন্সিগঞ্জে যেতে হয়েছে। এই কাজে আমাকে বেশী সহযোগিতা করেছেন আমার ভাই রাজু আহমেদ। তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত আমার মাঠ পর্যায়ের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এছাড়া মুন্সিগঞ্জের স্থানীয় সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যারা আমাকে সানন্দে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করেছেন। আমি আমার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; যারা আমাকে গবেষণা কার্য পরিচালনায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

এই গবেষণা পাণ্ডুলিপিটি কম্পিউটারে কম্পোজ করে দিয়েছে আমার অনুজ মাহমুদ আইউব। এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে আমার পরিবারের সকলেরই অবদান রয়েছে। আমি তাদের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

১. অভিজ্ঞান পত্র	: ----------	i
২. অঙ্গীকার পত্র	: ----------	ii
৩. কৃতজ্ঞতা স্বীকার	:----------	iii- iv
৪. প্রথম অধ্যায়	: ভূমিকা ----------	১- ৮
৫. দ্বিতীয় অধ্যায়	: ঐতিহাসিক পটভূমি -------	৯- ৩৯
৬. তৃতীয় অধ্যায়	: মুন্সিগঞ্জের মসজিদ স্থাপত্য --	৪০-৬৬
৭.চতুর্থ অধ্যায়	: মুন্সিগঞ্জের মন্দির স্থাপত্য ----	৬৭-৯৭
৮.পঞ্চম অধ্যায়	: মুন্সিগঞ্জের দুর্গ ও অন্যান্য স্থাপত্য-	৯৮-১০৭
৯. ষষ্ঠ অধ্যায়	: উপসংহার ----------	১০৮- ১১৪
১০.তথ্য নির্দেশ	: ----------	১১৫- ১২৪
১১. পরিশিষ্ট	: ----------	১২৫- ১৪৭
১২. পরিভাষা	:----------	১৪৮- ১৪৯
১৩. গ্রন্থপঞ্জি	: ----------	১৫০-১৭০
১৪. চিত্র তালিকা	: ক. মানচিত্র ----------	১৭১- ১৭৩
	: খ. ভূমি নকশা----------	১৭৪- ১৯৭
	: গ. আলোকচিত্র ----------	১৯৮- ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র ও রেখাচিত্রের তালিকা

মানচিত্র

মানচিত্র : ১ মুন্সিগঞ্জ (প্রাচীন বিক্রমপুর) পৃ. ১৭১

মানচিত্র : ২ মুন্সিগঞ্জ পৃ. ১৭২

মানচিত্র : ৩ মুন্সিগঞ্জ জেলা স্থাপত্য নিদর্শন, পৃ. ১৭৩

রেখাচিত্র

ভূমিনকশা : ১ বাবা আদম মসজিদ পৃ. ১৭৪

ভূমিনকশা : ২ টেঙ্গোরশাহী মসজিদ পৃ. ১৭৫

ভূমিনকশা : ৩ কোট গাঁ শাহী মসজিদ পৃ. ১৭৬

ভূমিনকশা : ৪ পাথরঘাটা মসজিদ পৃ. ১৭৭

ভূমিনকশা : ৫ বলালী মসজিদ পৃ. ১৭৮

ভূমিনকশা : ৬ আউটশাহী মসজিদ পৃ. ১৭৯

ভূমিনকশা : ৭ বাঁশবাড়ি মসজিদ পৃ. ১৮০

ভূমিনকশা : ৮ মশুরী পাড়া জামে মসজিদ পৃ. ১৮১

ভূমিনকশা : ৯ দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদ পৃ. ১৮২

ভূমিনকশা : ১০ রাধাগোবিন্দ মন্দির পৃ. ১৮৩

ভূমিনকশা : ১১ ফেগুনসার শিবমন্দির পৃ. ১৮৪

ভূমিনকশা : ১২আউটশাহী মঠ পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিনকশা : ১৩ ফেগুনসার মঠ পৃ. ১৮৬

ভূমিনকশা : ১৪ সতীদাহ মঠ পৃ. ১৮৭

ভূমিনকশা : ১৫ সোনারং মন্দির পৃ. ১৮৮

ভূমিনকশা : ১৬ শ্যামসিদ্ধির মঠ পৃ. ১৮৯

ভূমিনকশা : ১৭ কালী মন্দির পৃ. ১৯০

ভূমিনকশা : ১৮ কালীর আটপাড়া মন্দির পৃ. ১৯১

ভূমিনকশা : ১৯ হাঁসাড়া মঠ পৃ. ১৯২

ভূমিনকশা : ২০ চৌধুরী বাজার মঠ পৃ. ১৯৩

ভূমিনকশা : ২১ সরকার মঠ পৃ. ১৯৪

ভূমিনকশা : ২২ মাইজপাড়া মঠ পৃ. ১৯৫

ভূমিনকশা : ২৩ ইদ্রাকপুর দুর্গ পৃ. ১৯৬

ভূমিনকশা : ২৪ মীরকাদিম ব্রীজ পৃ. ১৯৭

আলোকচিত্র

চিত্র : ১ বাবা আদম মসজিদ পৃ. ১৯৮

চিত্র : ২ বাবা আদম মসজিদ পৃ. ১৯৮

চিত্র : ৩ বাবা আদম মসজিদ পৃ. ১৯৯

চিত্র : ৪ বাবা আদম মসজিদ পৃ. ১৯৯

চিত্র : ৫ বাবা আদম মসজিদ পৃ. ২০০

চিত্র : ৬ বার আউলিয়ার মাজার পৃ. ২০০

চিত্র : ৭ টেঙ্গোরশাহী মসজিদ পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র : ৮ টেঙ্গোরশাহী মসজিদ পৃ. ২০১
চিত্র : ৯ কোট গাঁ শাহী মসজিদ পৃ. ২০২
চিত্র : ১০ কোট গাঁ শাহী মসজিদ পৃ. ২০২
চিত্র : ১১ পাথরঘাটা মসজিদ পৃ. ২০৩
চিত্র : ১২ বলালী মসজিদ পৃ. ২০৩
চিত্র : ১৩ আউটশাহী মসজিদ পৃ. ২০৪
চিত্র : ১৪ বাঁশবাড়ি মসজিদ পৃ. ২০৪
চিত্র : ১৫ মশুরী পাড়া জামে মসজিদ পৃ. ২০৫
চিত্র : ১৬ মশুরী পাড়া জামে মসজিদ পৃ. ২০৫
চিত্র : ১৭ দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদ পৃ. ২০৬
চিত্র : ১৮ রাধাগোবিন্দ মন্দির পৃ. ২০৭
চিত্র : ১৯ ফেগুনসার শিবমন্দির পৃ. ২০৭
চিত্র : ২০ ফেগুনসার শিবমন্দির পৃ. ২০৮
চিত্র : ২১ আউটশাহী মঠ পৃ. ২০৮
চিত্র : ২২ ফেগুনসার মঠ পৃ. ২০৯
চিত্র : ২৩ সতীদাহ মঠ পৃ. ২০৯
চিত্র : ২৪ সোনারং মন্দির পৃ. ২১০
চিত্র : ২৫ শ্যামসিদ্ধির মঠ পৃ. ২১০
চিত্র : ২৬ কালীমন্দির মধ্যপাড়া পৃ. ২১১
চিত্র : ২৭ কালী মন্দির আটপাড়া পৃ. ২১১
চিত্র : ২৮ হাঁসাড়া মঠ পৃ. ২১২
চিত্র : ২৯ চৌধুরী বাজার মঠ পৃ. ২১২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র : ৩০ সরকার মঠ পৃ. ২১৩

চিত্র : ৩১ মাইজপাড়া মঠ পৃ. ২১৩

চিত্র : ৩২ ইদ্রাকপুর দুর্গ পৃ. ২১৪

চিত্র : ৩৩ ইদ্রাকপুর দুর্গ পৃ. ২১৪

চিত্র : ৩৪ মীরকাদিম সেতু পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভারতের একটি অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী জনপদের নাম বঙ্গ। পূর্ববংগ, সমতট বলতে ঐতিহাসিকগণ এই বঙ্গ অঞ্চলকে বুঝিয়েছেন।[১] যতদুর জানা যায় প্রাচীনকালে বিক্রমপুর সমতটের অন্তর্ভুক্ত একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। বিক্রমপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ। এখানে প্রাচীন অজস্র ইট, পাথরের খন্ড ও মৃৎপাত্রের টুকরার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া সারা বিক্রমপুর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন খাল-বিল, পুষ্করিণী, জলাশয় ও স্থাপত্য ইমারত। এক সময়ের সমৃদ্ধ বিক্রমপুর নগরীর অনেক এলাকা এবং স্থাপত্য ইমারত নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ; ফলে এই অতি সমৃদ্ধ নগরীটি ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়েছে এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবস্থানগত পরিসীমা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতি ধারণ করেছে। এ পর্যন্ত কোন গবেষণায় এই অঞ্চলের স্থাপত্য কীর্তির উপর পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়নি। "বিক্রমপুরের ইতিহাস ও স্থাপত্য" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি দ্বারা এই প্রাচীন জনপদটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ পূর্বক এ অঞ্চলের স্থাপত্য কীর্তি বিষয়ে একটি সামগ্রিক রূপরেখা বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা গৃহীত হয়েছে । মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিক্রমপুর বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়। সংগত কারণে বিক্রমপুরে পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম এই তিন ধর্মের অনুসারীদের স্থাপত্য

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশ লাভ করেছে। অধিকন্তু বিক্রমপুর অঞ্চলের দীর্ঘ সময়কালে গড়ে উঠা স্থাপত্যের পশ্চাতে এখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এককালের বিক্রমপুর পরবর্তীতে মুন্সিগঞ্জ নাম ধারণ করেছে। মুন্সিগঞ্জে অতীতে সংঘঠিত ঘটনাবলী পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা অবহিত হতে পারি।

মুন্সিগঞ্জ জেলাটি বর্তমানে ঢাকা বিভাগের সতেরটি জেলার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি জেলা। কিন্তু কয়েকশত বৎসর পুর্বে মুন্সিগঞ্জ নামে বঙ্গের কোন অঞ্চল পরিচিত ছিল বলে জানা যায় না; তবে বিক্রমপুর নামে একটি অতি সমৃদ্ধ নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের অধিকাংশ এলাকা নিয়েই বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা গঠিত। তাই মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে চলে আসে বিক্রমপুরের ইতিহাস। বিক্রমপুর নগরীর ইতিহাস পর্যালোচনা ব্যতীত মুন্সিগঞ্জের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যাবে। মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস সম্মন্ধে লিখিত তথ্যাদি বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বই, প্রতিবেদন, দলিল-দস্তাবেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই গবেষণাকর্মে সেসব তথ্যাদি সমন্বয়ের মাধ্যমে সন্নিবেশিত করে মুন্সিগঞ্জ সম্মন্ধে একটি সামাগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা গৃহীত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট যে সব তথ্যাদি পাওয়া যায় তাতে স্থাপত্য বিষয়ে খুব সামান্যই উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ)*[২] গ্রন্থে বঙ্গের বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

কালে পৃথকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী হিসেবে বিক্রমপুরের উল্লেখ করলেও পৃথকভাবে বিক্রমপুর অঞ্চলের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি।

বাংলার ইতিহাস (আদিপর্ব)[৩] গ্রন্থের প্রণেতা নীহার রঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে গতানুগতিক ভাবে বাংলার ইতিহাস আলোচনা করেছেন। প্রাচীন কালের এই সমৃদ্ধিশালী নগরটি সম্পর্কে তিনিও বিস্তারিত ভাবে কিছু আলোচনা করেননি। ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব(১২০৪-১৩৩৮)*[৪] গ্রন্থে অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতই বঙ্গ জনপদের বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলোতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশ গুলোর সাথে বিক্রমপুর নগরের অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ থাকার কারণে অতীতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ও তাদের অবদানের কথা আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস[৫] গ্রন্থের রচয়িতা বৃন্দের মধ্যে প্রথম পর্বের অন্যতম রচয়িতা ইতিহাসবিদ আবদুল মমিন চৌধুরী তাঁদের গ্রন্থে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এসময় বিক্রমপুর (রাজধানী) হতে যে বাংলার শাসনকার্য পরিচালিত হত সে সম্পর্কে এবং বংশানুক্রমিক রাজবংশের বিবরণ এখানে উল্লেখ করেন। তাঁদের গ্রন্থটি বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে যথেষ্ঠ পরিমানে সহায়তা করেছে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এক কালের সমৃদ্ধ নগরী বিক্রমপুরের স্থাপত্য সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

বিক্রমপুরের ইতিহাস[৬] গ্রন্থের রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এই সমৃদ্ধ নগরীটির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কখনও কখনও পক্ষপাতমুলক বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাসত্ত্বেও মুন্সিগঞ্জের অতীত জানার ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বিবেচিত। এই গ্রন্থটিতে গুপ্ত শাসন আমল থেকে শুরু করে সেন শাসন আমল পর্যন্ত ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থটিতে বিক্রমপুরকে সেন আমলের রাজধানী বলা হয়েছে। কিন্তু বইটির প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় বিক্রমপুর যে চন্দ্র, বর্ম ও সেন আমলের রাজধানী ছিল তা তিনি তথ্য প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন। হিমাংশু মোহন শর্মা নামক আরেকজন ঐতিহাসিক *বিক্রমপুর* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থটিতে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে খুব বেশী দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তিনি প্রামাণ্য তথ্য অপেক্ষা অতিরঞ্জিত বিষয়ের বর্ণনাই বেশী দিয়েছেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস রচনা করেছেন আরেকজন গ্রন্থপ্রণেতা অম্বিকাচরন ঘোষ। তাঁর গ্রন্থটিতেও তিনি বিক্রমপুরের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করে মূল প্রসংগ থেকে দূরে সরে গেছেন। ফলে তাঁর ইতিহাস বর্ণনা অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলেছে।

ঢাকার ইতিহাস[৭] গ্রন্থের প্রণেতা যতীন্দ্র মোহন রায় তাঁর গ্রন্থে ঢাকার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বিক্রমপুরের ইতিহাস ও স্থাপত্য নিদর্শনের উপর আংশিক আলোকপাত করেছেন। এক সময়ের সমৃদ্ধিশালী নগরী কালের বিবর্তনে অতীতের জৌলুস

Dhaka University Institutional Repository

হারিয়ে শ্রীহীন হয়ে পড়ে এবং ঢাকার অন্তর্গত পাঁচটি অঞ্চলের একটি অঞ্চলে পরিণত হয় এ বিষয়টি যতীন্দ্র মোহন রায়ের গ্রন্থ হতে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এই গ্রন্থটি বিক্রমপুরের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

আ. ক. ম. জাকারিয়া প্রণীত *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*[৮] গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর গ্রন্থে বিক্রমপুরের কিছু সংখ্যক স্থাপত্যের উপর আংশিক আলোকপাত করেছেন। এছাড়া সে সময়ের দীঘি পুষ্করিণী সম্পর্কেও তাঁর লেখায় কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানকার স্থাপত্যের বিষয়নিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের কোন রূপ বিস্তৃত আলোচনা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর হতে প্রকাশিত মোহাম্মদ আবু মুসা কর্তৃক প্রণীত *Archaeological Survey Report Munshiganj District*[৯] গ্রন্থে মুন্সিগঞ্জের স্থাপত্য এবং বিভিন্ন প্রত্নস্থলের বিবরণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য তাঁর উপস্থাপনায়ও কিছু কিছু স্থাপত্য নিদর্শন স্থান পায় নি। অধিকন্তু মোহাম্মদ আবু মুসার বিশ্লেষণে স্থাপত্যের বিভিন্ন দিক যথাযথ ভাবে আলোক প্রাপ্ত হয়নি।

Archaeological Survey of India, report of a tour in Bihar and Bengal in (১৮৭৯-৮০) from Patna to Sunargaon Vol-iv গ্রন্থে[১০] Alexander Cunningham বিক্রমপুরে অবস্থিত স্থাপত্য সম্পর্কে যেভাবে আলোকপাত করেছেন তাতে স্থাপত্য ইতিহাস অপেক্ষা প্রাধান্য পেলেও স্থাপত্যের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেনি। তিনি তখন তাঁর জরিপে প্রাপ্ত স্থাপত্য নিদর্শন গুলোই কেবল তুলে ধরেছেন। তাঁর জরিপের বাইরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থাপত্য নিদর্শন রয়ে গেছে যা আলোচ্য গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্রিটিশ আমলে আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। এসময় ঔপনিবেশিক শাসকদের উৎসাহে *District Gazetter* লেখার কাজ শুরু হয়। কিন্তু গেজেটিয়ার তৈরীর কাজ যে উদ্যম নিয়ে শুরু হয়েছিল তা অচিরেই থেমে যায়। ব্রিটিশদের অনুকরণে অনেকেই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়ে উঠে। কিন্তু ইতিহাস চর্চা ও লিখনের জন্য যে ব্যাপক গবেষণা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন তা সবসময় অবহেলিত থেকেছে। অধিকন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার পরিবর্তে পক্ষপাতিত্বের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ইতিহাস চর্চাকারীদের হাতে পড়ে প্রাসংগিকতার পরিবর্তে অপ্রাসংগিক বিষয়ের অবতারণা বেশী হয়েছে। ফলে ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস সংক্রান্ত যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলোও কম বেশী এসব দোষ থেকে মুক্ত নয়। সঠিকভাবে বিক্রমপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনাও সম্পূর্ণতা পায়নি। বিক্রমপুর যখন নগরীর মর্যাদা হারায় তখন থেকে বিক্রমপুর সম্পর্কিত আলোচনা এর গুরুত্ব হারিয়ে অস্পষ্টতায় পর্যবসিত হয়।

কোন অঞ্চলের ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্মন্ধে সার্বিক ধারণা তুলে ধরতে একজন গবেষক গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী উপাত্ত ও উপাদানই শুধু সংগ্রহ করেন না বরং অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ করে ইতিহাস পূণর্গঠন করেন। আলোচ্য এম.ফিল. গবেষণা কর্ম সম্পাদনে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) এ পর্যন্ত এই অঞ্চলের যেসব সাহিত্য, ইতিহাস, পত্র পত্রিকা দলিল-দস্তু

Dhaka University Institutional Repository

াবেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো মূখ্য উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ জরিপভিত্তিক বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে (Survey and Observation Method) আলোকচিত্র ও রেখাচিত্র সহযোগে স্থাপত্য নিদর্শনের পরিচয় উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এই গবেষণা কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে রামপাল, কাজীকসবা, আব্দুল্লাহপুর, মীরকাদিম, মানেকশ্বর, সোনারং, মাকুহাটি, আটপাড়া, বজ্রযোগিনী, পানহাট্টা, খালপাড়া, শুয়াপাড়া, চুড়াইন, পাথরঘাটা, পঞ্চসার, কেওয়ার, চারপাড়া, বিশিপাড়া, টংগীবাড়ী, চাপাতুলী, শ্রীনগর, রামপুর, লৌহজং, হলদিয়া, বেজগাঁও সহ পার্শ্ববর্তী আরও এলাকা (যা প্রাচীন বিক্রমপুর নগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল) পর্যন্ত। এই গবেষণা কার্যের সুনির্দিষ্ট কোন সময় নির্ধারিত হয়নি। তবে এই গবেষণা কর্মে মোটামুটি বিক্রমপুর যখন হতে নগরীর মর্যাদা লাভ করে তখন থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস ও স্থাপত্য সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার সহ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ; এই অধ্যায়ে কোন বিষয়ের উপর গবেষণা করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে, অর্থাৎ গবেষণা করার যৌক্তিকতা কি, কোন পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, গবেষণার পরিধি, গবেষণার জন্য কি ধরণের প্রবন্ধ, গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঐতিহাসিক পটভূমি; এই অংশে মুন্সিগঞ্জের বর্তমান ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ, জলবায়ু, নদ-নদী সম্পর্কে আলোচনার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে বর্তমান এলাকার সাথে পূর্বের এলাকার পার্থক্য পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ধারাবাহিক ভাবে বিক্রমপুরের বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম শাসন কালের ইতিবৃত্ত সম্মন্ধে বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: মুন্সিগঞ্জের মসজিদ স্থাপত্য; এই অধ্যায়ে মুন্সিগঞ্জে বিকশিত সুলতানী, মুগল ও মুগল পরবর্তী আমলের মসজিদ এবং দুটি মাজার সম্মন্ধে এদের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের আলোকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: মুন্সিগঞ্জের মন্দির স্থাপত্য; এই অধ্যায়ে মুন্সিগঞ্জে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নির্মিত মন্দির ও মঠ স্থাপত্য নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: মুন্সিগঞ্জের দুর্গ ও অন্যান্য স্থাপত্য; এই অধ্যায়ে মুন্সিগঞ্জে নির্মিত দুর্গ ও অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার; মুন্সিগঞ্জের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের সামগ্রিক পর্যালোচনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মুন্সিগঞ্জে বিদ্যমান স্থাপত্য ইমারত সমূহের সাথে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের স্থাপত্য ইমারতের নির্মাণ পদ্ধতি, স্থাপত্য রীতি ও অলংকারিক শৈলী সমূহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মুন্সিগঞ্জের স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক পটভূমি

মুন্সিগঞ্জের ভৌগলিক অবস্থান

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম একটি ব-দ্বীপ। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটিকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। এই নদ-নদীগুলো এই অঞ্চলের ভূমি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ভূমি ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অনেক অংশের তুলনায় নবীন। তবুও প্রাচীনকাল হতেই বাংলাদেশের এই অঞ্চলই শাসকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাই এই অঞ্চলটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। ভূমির গঠন অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূমিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত: পাহাড়ী এলাকা, দ্বিতীয়ত: প্লাইস্টোসিন এর সোপান ভূমি এবং সাম্প্রতিক কালের প্লাবন ভূমি। মুন্সিগঞ্জ তথা বিক্রমপুরের প্রায় সমগ্র এলাকাই প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত।

ঢাকা হতে মুন্সিগঞ্জ জেলাটি ৯.৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই জেলাটি ২৪° ১৯´ ৪৭´ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪° ৩৭´ ২৩´ ডিগ্রী পর্যন্ত এবং ৯০° ৯´ ৫৪´ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯০°৪৩´ ১৩´ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।[১১] মুন্সিগঞ্জ জেলাটি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলা, সিরাজদিখান, টঙ্গীবাড়ী, শ্রীনগর, লৌহজং ও গজারিয়া উপজেলা অর্থাৎ মোট ছয়টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। এই জেলার মোট আয়তন ২,৪০,৮০০ একর এবং বেশীর ভাগ এলাকাই প্রাচীন বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। শুধুমাত্র গজারিয়া থানা ত্রিপুরার অন্তর্গত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। পরবর্তীতে ভৌগলিক সীমারেখা পরিবর্তনের কারণে গজারিয়া মুন্সিগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সীমাঃ নদী বিধৌত বিক্রমপুরের সীমা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে মুন্সিগঞ্জের পশ্চিম দিক ব্যতীত বাকী তিন দিকই নদী পরিবেষ্টিত। পূর্ব দিকে মেঘনা নদী, দক্ষিণ দিকে পদ্মা এবং উত্তর দিকে ধলেশ্বরী নদী। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বিক্রমপুরের সীমা প্রাকৃতিক এবং প্রশাসনিক কারণে বহুবার বহুভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। চন্দ্রবংশের শাসক শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন গুলো যেসব গ্রাম হতে আবিস্কৃত হয়েছে এবং তাম্রশাসনে যেসব গ্রামের উল্লেখ রয়েছে তাতে বুঝা যায় তখন ফরিদপুর, বরিশাল জেলা পর্যন্ত বিক্রমপুরের সীমা বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে বর্ম, সেন, সুলতানী, ভুঁইয়া, মুগল এবং ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বিক্রমপুরের সীমার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নদীর আক্রমনে সমৃদ্ধিশালী বিক্রমপুর অঞ্চলের সীমানা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। জেমস রেনেলের ১৭৮১ সালের মানচিত্র দেখলে বুঝা যায় বিক্রমপুরের সীমার কতটা পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূমি ছিল।[১২] ১৮৬৯ সালে পদ্মা নদী গতিপথ পরিবর্তন করে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে দক্ষিণ বিক্রমপুর ঢাকা জেলা হতে পৃথক হয়ে যায় [১৩] এবং প্রথমে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত গ্রামগুলো ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পদ্মা নদী উত্তর বিক্রমপুরকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুইভাগে বিভক্ত করেছে। যে নদীগুলোর আক্রমণে বিক্রমপুরের এমন হতশ্রী অবস্থা সেই নদীগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

ধলেশ্বরী নদীঃ ধলেশ্বরী যমুনার শাখা নদী। এই নদী বিক্রমপুরের উত্তর সীমা দিয়ে প্রবাহিত। এই নদী নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যমুনা নদীর একটি শাখা ময়মনসিংহের সলিমাবাদ নামক স্থানে প্রথমে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পরে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। এই শাখাই পরবর্তীতে ধলেশ্বরী নাম ধারণ করে পুনরায় দক্ষিণ ও পূর্বদিকে মানিকগঞ্জ থেকে সাভার পর্যন্ত এসে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পরে সাভার হতে ফুলবেড়িয়ার দক্ষিণ দিকে এসে বুড়িগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। এই স্থান থেকে ক্রমে রোহিতপুর, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা এবং রামকৃষ্ণাদির পথে পাইনার দক্ষিণে সিংদহ নামক একটা শাখা নদীর সাথে মিলিত হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে কলাগাছিয়া নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা এবং মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। একসময় ইছামতি নদী বিক্রমপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। কিন্তু প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব হতে ইছামতি নদী মরা নদীতে পরিণত হয়ে ধলেশ্বরী নদীর সাথে মিশে গেছে। বর্তমানে সিরাজদিখানের কাছে ইছামতি নদীর একটি ক্ষীণ খালের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। যা বর্তমানে সেরাজাবাদের গাঙ নামে পরিচিত। কিরিঙ্গিবাজার এবং ইদ্রাকাপুর দুর্গ ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল কিন্তু ধলেশ্বরীর প্রবল আক্রমণে ইছামতি নদী ধলেশ্বরী নদীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।[১৪]

মেঘনা নদীঃ বিক্রমপুরের পূর্ব দিক দিয়ে মেঘনা নদী প্রবাহিত। এই নদী ময়মনসিংহ জেলার পূর্বসীমা দিয়ে ঢাকা জেলার পূর্ব উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদী ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা জেলার দক্ষিণ পূর্ব কোণে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে ত্রিপুরা এবং পশ্চিম তীরে বিক্রমপুর অবস্থিত।[১৫] মেঘনা নদীর পশ্চিম দিকে একটি বিস্তৃত চর

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে পাওয়া যায় এই চরের পশ্চিমে রয়েছে একটি ক্ষীণ পানির ধারা। রেনেলের রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপ এবং সেটেলমেন্টের মানচিত্রে এ পানির প্রবাহকে ব্রম্মপুত্রের প্রাচীন খাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নদীটি মুন্সিগঞ্জ জেলার পূর্বদিকে ধলেশ্বরী নদীর সাথে মিলিত হয়ে ক্রমশ এঁকেবেঁকে পুরাতন দীঘির পাড়ের কাছে পদ্মা নদীর সাথে মিশেছে। এই নদীর পাশে মুন্সিগঞ্জের অনেক গুলো গ্রাম অবস্থিত। প্রাচীন ব্রম্মপুত্রের খাতে নারায়ণগঞ্জ জেলার লাঙলবন্দের তীর্থস্নান ঘাটের মতো যোগিনীঘাট নামে একটি তীর্থ স্নান ঘাট আছে।

পদ্মা নদী ঃ পদ্মা নদী বিক্রমপুরের সীমা পরিবর্তনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পদ্মা নদীর গতিপথ পরিবর্তনও অতি বিচিত্র। অতীত কাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই নদীর করাল গ্রাসে বিক্রমপুরের অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই নদীটি বিক্রমপুরের যে অংশ ভেদ করে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে তাতে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের বিচিত্রতাই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই অংশটিকে কীর্তিনাশা বলা হয়েছে। এই নতুন ধারাটি বিক্রমপুরের পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করে পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এমনই প্রবল আকার ধারণ করে যে প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হয়ে উঠে। জেমস রেনেলের অংকিত ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের মানচিত্রে দেখা যায় পদ্মা নদী বিক্রমপুরের অনেক পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সেই সময় কীর্তিনাশা বা নয়াভাঙ্গনী নদী নামে কোন নদীর অস্তিত্ব ছিল না। কেবলমাত্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর এবং ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে অপ্রশস্থ একটি পানির ধারা বিদ্যমান ছিল। এই পানির ধারাটি ছিল প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্ন। শত বৎসরের মধ্যে উদগত এই নদীটি

Dhaka University Institutional Repository

কালীগঙ্গার তীরে অবস্থিত বিক্রমপুরের গ্রামগুলো বিলীন করে দিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ১৮৪০ সালে জেমস টেইলর তাঁর *"Topography of Dhaka"* গ্রন্থে কীর্তিনাশা নদীর নাম উল্লেখ করেছেন।[১৬] পদ্মা নদীর অপর নাম কীর্তিনাশা। অনেকের মতে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ চাঁদ রায়, কেদার রায়ের অপূর্ব নিদর্শন সমূহ ধ্বংস করার কারণে এই নদীর নাম হয়েছে কীর্তিনাশা নদী।

এই নদীগুলো ছাড়াও সারা বিক্রমপুরে রয়েছে অসংখ্য খাল বিল। নদীগুলো প্রত্যেক বৎসরই এ অঞ্চলের জন্য প্রচুর পলি মাটি বহন করে আনে। তাই বিক্রমপুরের মাটি খুবই উর্বর। এখানে প্রচুর পরিমানে ধান, পাট, শাকসবজি ও রবিশস্য জন্মে। প্রাচীনকাল হতেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের রাজধানীর মর্যাদাপ্রাপ্ত এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধিশালী ছিল। পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থানান্তর করায় বিক্রমপুর সোনারগাঁয়ের অন্যতম একটি পরগনায় পরিণত হয়;[১৭] এবং মুগল আমলে এই পরগনাটির রাজস্ব আয় ছিল সর্বাধিক। মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ হতেই এই অঞ্চলটির রাজকীয় মর্যাদা লুপ্ত হলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত স্বীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। লিখিত তথ্যের অভাবে তৎকালীন বিক্রমপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খুব বেশী জানা না গেলেও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্যই পাওয়া গেছে। সম্রাট অশোকের শাসন আমল হতেই বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ সরাসরি মৌর্য শাসনাধীনে না থাকলেও এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। চন্দ্রবংশের শাসকরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং চন্দ্র শাসকদের সময় বৌদ্ধ ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বিক্রমপুরের অনেক স্থান হতে প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে যা থেকে বুঝা যায় একসময় এ অঞ্চলটি বৌদ্ধ প্রধান এলাকা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম সংস্কারক শ্রীজ্ঞান অতীশ বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।[১৮] ওদন্তপুরী বিহারে বৌদ্ধসংঘ আচার্য শীল রক্ষিতের কাছে তিনি দীক্ষা লাভ করেন এবং গুরু তাঁকে দীপঙ্কর উপাধি দেন।[১৯] পালরাজা দেবপাল তাকে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। তিব্বতে তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে পুনরায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেন। অতীশ শ্রীজ্ঞানের মত একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বিক্রমপুরে জন্মে ছিলেন কিন্তু বিক্রমপুরে আজ পর্যন্ত কোন বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়নি; যা কিছুটা অস্বাভাবিক। তবে একথা বলা যেতে পারে নদীবিধৌত বিক্রমপুরে নদীর ভাঙনের জন্য সঠিক ভাবে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালিত হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে দীঘি, পুষ্করিনী খনন, কৃষিকাজ বা রাস্তাঘাট নির্মাণ বা মেরামতের সময় প্রচুর বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্ম শাসনের প্রথমদিকে দক্ষিণ-পূর্ব বংগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও হরিবর্মার শাসন আমল হতে ব্রাহ্মন ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তার লাভ করতে থাকে। সেন শাসন আমলে বৌদ্ধ ধর্মের উপর খড়্গ নেমে আসে এসময় বাংলায় ব্যাপক ভাবে হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটে। সেন শাসকরা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সদাশিব মূর্তির পূজা করত। সেন শাসকদের মধ্যে কেউ ছিলেন শিবের উপাসক, কেউ বিষ্ণুর উপাসক, আবার কেউ ছিলেন সৌর উপাসক। বিক্রমপুরের আশপাশ হতে বিরল অর্ধনারীশ্বর মূর্তি এবং সূর্য মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।

বর্ম ও সেন শাসকরা বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মনদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[২০] এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বংগে বর্ণ প্রথা চরম আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালাত। ফলে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা। এসময় ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসকরা ছিল অপ্রতিরোধ্য। সেন শাসন আমলের শেষের দিকে অনেক পীর আউলিয়া বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। বিক্রমপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন বাবা আদম এবং তাঁর অনুসারীরা। ইসলামের সাম্য মৈত্রীর বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে নির্যাতিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। রাজকীয় ধর্ম গ্রহণ করায় সমাজে তাদের মর্যাদা প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারত উপমহাদেশে যখন মুসলিম শাসকদের জয় সূচিত হয় তখন বাংলায়ও তারা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নেয়। একসময় হিন্দু প্রধান অঞ্চল বিক্রমপুর ক্রমে ক্রমে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়।

নামকরণ ঃ নদীমেখলা বিক্রমপুরের ইতিহাস আলোচনা ঠিক কোথা থেকে শুরু করা যায় সেটা বিবেচ্য বিষয় হলেও যেহেতু বিক্রমপুর বঙ্গ জনপদের সমৃদ্ধ একটি নগরী তাই বঙ্গের ইতিহাসের সাথে বিক্রমপুরের ইতিহাসের রয়েছে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ। বস্তুত বঙ্গের ইতিহাস বিবর্তনের সাথে বিক্রমপুরের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতীতে গড়ে ওঠা বিক্রমপুর বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন হতে বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে নবদ্বীপ, সোনারগাঁ, লখণৌতি, সপ্তগ্রাম, ঢাকা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিতি লাভ করে নি তারও অনেক আগে থেকেই বিক্রমপুর শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকে বিক্রমপুরের নাম

Dhaka University Institutional Repository

কতটা প্রাচীন এ নিয়ে এবং বিক্রমপুরের নাম উৎপত্তি কেমন করে হলো এ নিয়ে প্রচলিত রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। বিক্রমপুরের নামকরণের পশ্চাতে এরকম একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সাথে সহোদর ভর্তৃহরির মনোমালিন্য হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য অভিমান বশত রাজ্য ভাইর হাতে অর্পণ করে রাজ্য ভ্রমনে বের হন এবং সে সময়ে সাগর তীরবর্তী সমতটের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এ এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেন। তারই নাম অনুসারে এই এলাকার নাম হয় বিক্রমপুর।[২১] ইতিহাস পর্যালোচনায় বিক্রমাদিত্য নামক একাধিক রাজার সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু এই বিক্রমাদিত্য কোন রাজবংশের রাজা ছিলেন সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয় নি। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অমূলক। বিপ্রকূলকল্পলতিকা পাঠে জানা যায় সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের পূর্ব পুরুষগণ সুদূর কর্ণাট প্রদেশ হতে বাংলায় আসেন। তাদের বংশধর বিক্রমসেনের নাম অনুসারেই এ এলাকার নাম বিক্রমপুর হয়েছে।[২২] এই সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক তার কারণ আমরা চন্দ্র, বর্ম বংশের শাসন আমল থেকেই বিক্রমপুর নামটি পাই বিক্রম সেনের সাথে বিক্রমপুর নামকরণের কোন সম্মন্ধ থাকতে পারেনা। কেউ কেউ আবার বিক্রমাঙ্ক চালুক্য বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুর নাম উৎপত্তির সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে এই বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত করে বিক্রমপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করেছেন। চালুক্য বিক্রমাদিত্যের জীবনী বিক্রমাঙ্কচরিত নামে পরিচিত। তাদের মতে বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি বিক্রমপুর নামক একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্ত উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদির অভাবে আমরা এ মত গ্রহণ করতে পারি না। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থে বিক্রমণীপুর নাম দেখতে পাওয়া যায়।[২৩] এ থেকেও বিক্রমপুর নাম হতে পারে। এগুলো সবই আনুমানিক

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তমাত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন বিক্রমপুরী বিহার[২৪] হতে বিক্রমপুর নাম হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন জায়গাটির নাম ও বিহারের নাম ধর্মপালের অপর নাম বিক্রমশীলা হতে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই মতামতটি অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তথ্য প্রমাণ সহকারে দেখিয়ে দিয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা সবসময়ই পাল শাসন হতে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই অঞ্চল পৃথক রাজবংশ দ্বারা শাসিত হতো। পালশাসকরা খুব অল্প সময়ের জন্য এই এলাকার উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। সুতরাং এই অঞ্চলের নাম ধর্মপালের নাম অনুসারে হয়েছে এরকম ধারণা করার অবকাশ নেই। পাল শাসকদের সমসাময়িক সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা অন্য রাজবংশ দ্বারা শাসিত হত। তাদের প্রদত্ত অনেক শিলালিপি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানী হিসেবে বিক্রমপুরের নাম নবম শতাব্দী থেকেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই নামটি বাংলার কোন শাসকের আনুকূল্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীচন্দ্রদেবের এ পর্যন্ত চারটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। আমরা এই তাম্রশাসনগুলি হতেই বিক্রমপুর রাজধানীর নাম জানতে পারি।[২৫] রাজধানীর নাম হতেই খুব সম্ভবতঃ সমস্ত এলাকার নাম বিক্রমপুর হয়েছে। চন্দ্র রাজাদের পর বর্ম এবং সেন শাসকরা বিক্রমপুর রাজধানী হতেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সুতরাং বিক্রমপুর নামটি কখন কার দ্বারা প্রচলিত হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিক্রমপুর নামটি যে সহস্র বৎসরের প্রাচীন সে সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই।

মুসলিম শাসনামলে সোনারগাঁয়ে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হলে সমৃদ্ধিশালী নগরী বিক্রমপুরের জৌলুস ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়া নদীবেষ্টিত বিক্রমপুর অঞ্চলের অনেক সমৃদ্ধ স্থান নদীগর্ভে

Dhaka University Institutional Repository

বিলীন হয়ে গেলে এই সমৃদ্ধ নগরীটি ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়ে। বিক্রমপুর নামটি হাজার বছরের প্রাচীন হলেও বর্তমানে বিক্রমপুর নামে কোন জায়গার অস্তিত্ব কাগজে কলমে নেই; বরং এখন শুধু এ নামটি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। মোহাম্মদ হান্নানের মতে, বিক্রমপুর যেহেতু পরগনা ছিল[২৬] সেহেতু জমিদারী প্রথা বিলোপের সাথে সাথে বিক্রমপুর নামটি সরকারী নথিপত্র হতে মুছে গেছে।

মুগল শাসনামলে বিক্রমপুরে ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা হয়। এই ফৌজদারী আদালত মুগল আমলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল।[২৭] এই সময়ে এ স্থানে মুন্সী হায়দার নামে একজন ফৌজদার ছিলেন তার নাম অনুযায়ী এ স্থানের নাম মুন্সিগঞ্জ হয়েছে[২৮] বর্তমানে মুন্সিগঞ্জের একমাত্র উপজেলা গজারিয়া পূর্বে ত্রিপুরার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্ত শ্রীনগর, লৌহজং, সিরাজদিখান, টংগীবাড়ী, ইদ্রাকপুর (যা বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ সদর নামে পরিচিত)। এই নামেই এই প্রাচীন এলাকা বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ নামে পরিচিতি লাভ করেছে । ফলে অতি পরিচিত ঐতিহাসিক বিক্রমপুর নামটি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। বংগ জনপদের একটি সমৃদ্ধিশালী অংশ ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বংগ। এই অংশের বিক্রমপুর এলাকাটি প্রাচীনকাল হতেই শাসক শ্রেনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ধারণা করা হয় সম্রাট অশোকের সময় হতে এই এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। পরবর্তী কালে অঞ্চলটি বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল তার প্রমাণ মেলে এ অঞ্চলে প্রাপ্ত অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি হতে। খ্রীস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধে গুপ্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা লাভ বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গুপ্ত রাজবংশের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যখন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তখন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা মগধের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে স্বাধীন সামন্ত নৃপতিরা শাসনকার্য পরিচালনা করত। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর বংগ, ডবাক, কামরূপ নেপাল জয় করে সেখানকার নৃপতিদের কর দিতে বাধ্য করেন। তার রাজত্ব কালের ইতিহাস এলাহাবাদের দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত অশোক স্তম্ভের গায়ে খোদিত সংস্কৃত লিপি হতে জানতে পারা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কবি কালীদাস তার রঘুবংশ নামক কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলার শাসকরা সবসময় নৌবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কালীদাসের এই বর্ণনাকে সত্য তথ্য হিসাবে গ্রহণ করলে সমুদ্রগুপ্তকে বংগ বিজয়ের জন্য বংগের শাসন কর্তাদের সাথে নৌযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল; এই নৌযুদ্ধ সম্ভবত বিক্রমপুরবাসীর সাথে হয়েছিল। এসময় বিক্রমপুর খুব সম্ভব গুপ্ত শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর বাংলার শাসকরা পুনরায় স্বাধীন হয়ে পড়লে চন্দ্রগুপ্তকে পুনরায় বাংলার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। তাই অনেক ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নামকরণের সাথে বিক্রমপুর নামকরণের একটি সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু চন্দ্রগুপ্ত বাংলার বিদ্রোহীদের পরাজিত করে বংগ রাজ্যকে পুনরায় করদ রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ; সুতরাং তার নামের সাথে বিক্রমপুর নামকরণের সংযোগ অসম্ভব কিছু নয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করেন। এসময় উত্তর বংগ গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল তার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসন সমূহ হতে পূর্ববাংলা গুপ্ত শাসকদের অধীন ছিল কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয় যে, বংগের স্বাধীনচেতা সামন্ত নৃপতিরাই এসময় বংগ শাসন করছিল। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বংগ গুপ্ত শাসকদের করদ রাজ্য ছিল। ৫০৭ খ্রীস্টাব্দে প্রচলিত গুনাইগড় তাম্রশাসন হতে জানা যায় এসময় বংগ গুপ্ত শাসকদের অধীনে ছিল। বংগে গুপ্ত শাসকদের যে প্রভাব ছিল সে সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করার খুব একটা অবকাশ নেই। গোপালগঞ্জের কোটালী পাড়ায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একটি ময়ূরাঙ্কিত মুদ্রা ও স্কন্দগুপ্তের সময়ের একটি সূবর্ণ মুদ্রা এবং মূলচর গ্রামে ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত একটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন যা বর্তমানে বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত আছে।[২৯] সুতরাং বংগ গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল বা গুপ্ত শাসকদের সাথে বংগের শাসকদের ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। উত্তর বংগের মত দক্ষিণ-পূর্ব বংগে গুপ্ত শাসকদের কোন প্রাচীন মূর্তি বা নিদর্শন এখনও আবিস্কৃত না হওয়ায় বংগে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও বংগ যে গুপ্ত শাসকদের করদ রাজ্য ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। গোপালগঞ্জের কোটালী পাড়ায় পাঁচটি তাম্রশাসন, মল্লাসারুলে একটি এবং বালেশ্বর জেলার জয়গ্রাম গ্রামে একটি সহ মোট সাতটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে।[৩০] এই তাম্রশাসন গুলো দক্ষিণ- পূর্ব বাংলার ইতিহাস রচনায় নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। উত্তর বংগে যেখানে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে দক্ষিণ- পূর্ব বংগ ভিন্ন শাসক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই তাম্রশাসনগুলো হতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামক তিনজন নৃপতির নাম পাওয়া যায়।[৩১] তারা মহারাজা উপাধি গ্রহণ এবং সার্বভৌম শাসক হিসাবে বংগে শাসনকার্য পরিচালনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। এদের মধ্যে গোপচন্দ্র মহারাজা ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বংগে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জয়রামপুর ও মল্লসারুল তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, তার রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোপচন্দ্রের পর ধর্মাদিত্য রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তার পরবর্তী শাসক সমাচার দেব। এই তিন শাসক দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা মোটামুটি ৫২৫ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে শাসন করেন। পন্ডিতদের মতে, চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মন অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ জয় করে বাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটান। এসময় গৌড়রাজ শশাংক পূর্ববাংলা অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা জয় করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ভদ্ররাজবংশ নামক নতুন এক রাজবংশের নাম পাওয়া যায়।[৩২] চীনা পর্যটক হিউয়েন সাংয়ের মতে, নালন্দা বিহারের মত বিখ্যাত বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষু শীলভদ্র সমতট অঞ্চলের ব্রাম্মন রাজবংশদভুত ছিলেন। ঢাকা জেলার আশরাফপুরে দুটি[৩৩] এবং কুমিল্লার দেউলবাড়ী গ্রামে একটি[৩৪] মোট তিনটি তাম্রশাসন হতে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় খড়্গ রাজবংশের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারি। পূর্বে ধারণা করা হতো উত্তর বংগের সাথে দক্ষিণ বংগের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং উত্তর বংগ হতে দক্ষিণ বংগ শাসিত হত। দেউলবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত ধাতু নির্মিত দূর্গামূর্তি হতে খড়োদগম, জাতখড়্গ ও দেবখড়্গ নামক তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়েছে।[৩৫] কিন্ত তাম্রশাসন গুলো বেশী পরিমানে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এই তিনজন রাজার নাম ব্যতীত তাদের শাসন কাল ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। ধারণা করা হয় তাদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার বড় কামতায়। লোকনাথের ত্রিপুরায় প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

তাম্রশাসন এবং শ্রীধারণ রাটের কৈলান তাম্রশাসন হতে দুজন সামন্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। তারা খুব সম্ভবত খড়্গ রাজ বংশের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। এই সামন্ত রাজারা খড়্গ রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে প্রায় স্বাধীন নৃপতি হিসেবে রাজ্য শাসন করতেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত উত্তর বাংলা যখন পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত সেসময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বৈদেশিক আক্রমণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। এসময় পূর্ব বাংলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো। খড়্গ শাসনের অবসানের পর দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেব রাজ বংশের উদ্ভব ঘটে। এই পর্যন্ত এই রাজ বংশের তিনটি তাম্রশাসন[৩৬] এবং দুটি মুদ্রা ময়নামতিতে আবিস্কৃত হয়েছে।[৩৭] যা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়তা করেছে। এই তিনটি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এই তাম্রশাসন হতে শ্রী আনন্দ দেবের ভূমিদান এবং শ্রীভবদেব কর্তৃক তা অনুমোদনের তথ্য জানা যায়। এই তাম্রশাসনসমূহ হতে দেব রাজাদের চার পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তারা সবাই পরমসৌগত, পরমভট্টারক, পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাদের তাম্রশাসনে যেসব স্থানের নামোল্লেখ আছে তা থেকে বুঝা যায় যে তারা সমতটে রাজত্ব করতেন। তাদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। তাম্রশাসন হতে দেবপর্বতের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে দেবর্পবত কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এই রাজ বংশের প্রাপ্ত তাম্রশাসন এবং মুদ্রার লিপি বিচারে ধারণা করা হয় সমতটে খড়্গ রাজবংশের পতনের পর দেব রাজবংশের উত্থান ঘটে। একই সময়ে উত্তর বংগে পাল রাজবংশের সূচনা হয়। দেব রাজবংশ অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত রাজত্ব

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাদের তাম্রশাসন গুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এরচেয়ে বেশী কিছু জানা যায় নি। তাদের শাসন আমল সমাপ্ত হওয়ার পর কান্তিদেব নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায় তাঁর সময়ে প্রদত্ত লিপিতত্ত্বের বিচার করে পন্ডিতগণ তার সময়কাল নবম শতাব্দীর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সাথে দেব রাজাদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নি। তিনি দেব রাজাদের মতই পরমসৌগত, পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হরিকেলের রাজা ছিলেন বলে জানা যায়। হরিকেলের বর্তমান ভৌগলিক সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও সাধারণভাবে বংগ ও হরিকেল একই অঞ্চলের সমার্থক ছিল বলে ধারণা করা হয়। একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এসময় শ্রীকান্তিদেবের শাসনাধীনে ছিল। তার উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ ধারণা করা হয়ে থাকে তার উত্তরাধিকারদের পরাজিত করায় দক্ষিণ-পূর্ব বংগে শক্তিশালী চন্দ্র রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলায় শক্তিশালী পাল নৃপতিরা যখন প্রবল প্রতাপের সাথে বিভিন্ন স্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে চলেছিল সে সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বংগে শক্তিশালী চন্দ্ররাজ বংশের উত্থান ঘটে। কুমিল্লার ময়নামতিতে তিনটি ঢাকায় একটি এবং সিলেটের পশ্চিমভাগে প্রাপ্ত একটি মোট পাঁচটি তাম্রশাসন হতে শক্তিশালী চন্দ্র রাজবংশ সম্পর্কে জানা যায়।[৩৮] পূর্বে এধরণের ধারণা ছিল শক্তিশালী পাল শাসকরাই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শাসন করত। কিন্তু এই তাম্রশাসন গুলোর পাঠোদ্ধারের পর ইতিহাসবিদদের ভুল ধারণার অবসান ঘটে। অনেক ঐতিহাসিক ধর্মপালকে বাঙলার অধিপতি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় এসময় বংগ চন্দ্র শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্র বংশের রাজারা রোহিতগিরির অধিবাসী ছিলেন। রোহিতগিরির অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ রোহিতগিরি বলতে বিহারের রোহিত সাগরকে বুঝিয়েছেন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রোহিতগিরি কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলে অবস্থিত এবং তারা সেখানের ভূস্বামী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং একটি শক্তিশালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের তাম্রশাসন হতে জানা যায় ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ ও হরিকেলের রাজ্যপতি ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সমতট অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বংগে নিজ রাজবংশের বিস্তার ঘটান। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কোন তাম্রশাসন আবিস্কৃত না হওয়ায় তার শাসনকাল ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। সিলেটের পশ্চিমভাগ এবং ঢাকা হতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হতে তার রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে জানা যায়। তিনি গৌড় ও নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চন্দ্র বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁর সময়ে চন্দ্র বংশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে শ্রীহট্টও চন্দ্র সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। তাম্রশাসন হতে জানা যায় তিনি কামরূপ রাজ্যের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু কামরূপের কোন অংশ তার রাজ্যভুক্ত হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট জানা যায়নি। লডহচন্দ্রের তাম্রশাসন হতে জানা যায় তিনি পালরাজা দ্বিতীয় গোপালকে গৌড়ের সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিলেন। এসময় প্রায় সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব বংগ শ্রীচন্দ্রের শাসনাধীনে ছিল। তার শাসন আমলে মোট

Dhaka University Institutional Repository

ছয়টি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে এবং প্রতিটি তাম্রশাসনই রাজধানী বিক্রমপুর হতে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৯] একটি তাম্রশাসনে আবার পদ্মা নদীর উল্লেখ আছে। অর্থাৎ বিক্রমপুরে পদ্মা নদীর অস্তিত্ব প্রাচীনকাল হতেই ছিল।[৪০] শ্রীচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কল্যাণচন্দ্র সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর আমলের একটি মাত্র তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। তাঁর শাসন আমল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি। তবে তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের তাম্রশাসন হতে জানা যায় তিনি কামরূপের ম্লেচ্ছরাজ এবং গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন। এসময় তিনি কম্বোজ বংশীয় কোন গৌড়রাজকে পরাজিত করে পালবংশীয় নৃপতিকে সিংহাসনে আরোহনে সহায়তা করেছিলেন। তাঁর সময়েও বিক্রমপুর রাজধানী ছিল এবং এখান হতেই শাসনকার্য পরিচালিত হত। কল্যাণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার পুত্র লডহচন্দ্র সিংহাসনে আরোহন করেন। ময়নামতিতে লডহচন্দ্রের দুটি এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের একটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে।[৪১] লডহচন্দ্রের তাম্রশাসন হতে রাজ্য বিজয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি। কুমিল্লা জেলার ভারেল্লায় নর্তেশ্বর শিবের এসময়ের একটি বিরাট মূর্তি পাওয়া গেছে।[৪২] ধারণা করা হয় এসময় হতে বংগে শিব পূজার প্রচলন হয়। লডহচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র সিংহাসনে আরোহন করেন। এসময় চোল রাজ রাজেন্দ্র চোলের প্রশস্তিতে চন্দ্র রাজ্যকে অবিরাম বর্ষাবারিসিক্ত বঙালদেশ বলা হয়েছে।[৪৩] বংগালদেশ বলতে মূলত পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বংগকে বুঝায়। এসময় কলচুরিরাজ কর্ণ ও পূর্ববংগ আক্রমণ করেন ফলে চন্দ্ররাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। বহি:শত্রুর পুন:পুন: আক্রমণে চন্দ্র রাজ্যের অবসান এবং বর্ম রাজ্যের উত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে কলচুরিরাজ কর্ণ ও পাল রাজ বিগ্রহপালের মধ্যে সুসম্পর্কের কারণে এসময় দক্ষিণ-পূর্ব বংগে খুব অল্প

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের জন্য পাল রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। তা বর্তমানে ঐতিহাসিক দিক হতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় পাল শাসকদের নির্দশন আজও চোখে পড়ে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বংগে পাল শাসনের স্থায়ী কোন নিদর্শনই চোখে পড়ে না। বহিশত্রুর আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। ইতোমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বংগে বর্ম রাজবংশের উত্থান ঘটে। বর্ম রাজবংশের কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে যা এই রাজ্য সম্পর্কে জানতে সহায়তা করেছে। ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসন, ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর শিলালিপি, বজ্রযোগিনী গ্রামে প্রাপ্ত সামলবর্মার তাম্রশাসন এবং হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে । শেষ দুটি তাম্রশাসন হতে এই রাজবংশের ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে। এ তাম্রশাসন হতে ব্রজবর্মা নামক একজন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় যিনি যাদব সেনার সমরনায়ক ছিলেন। বর্ম রাজাদের আদিনিবাস ছিল সিংহপুরে। তারা এতদূর হতে এসে কিভাবে বংগে রাজ্য স্থাপন করেন সে ব্যাপারে এ তাম্রশাসন থেকে কিছু জানা যায় নি। তবে ধারণা করা হয় জাতবর্মা রাজা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করে অঙ্গ, কামরূপে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এসময় পাল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে সামন্তশ্রেনীর বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কর্ণ উত্তর বংগের পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ববংগে ও (১০৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে) অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। পালশাসক এসময় কৈবর্ত নায়ক দিব্যোকের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময়ে জাতবর্মা দক্ষিণ-পূর্ব বংগে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ম শাসকরাও চন্দ্ররাজাদের মতো বিক্রমপুর রাজধানী হতে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এসময় দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও উত্তর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন রামপাল। জাতবর্মা বর্ম রাজবংশের প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

শাসক ছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি কলচুরি রাজ কর্ণের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ গ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম বজ্রযোগিনী গ্রামে সামলবর্মার একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে।[৪৪] এই তাম্রশাসন হতে জানা যায় জাতবর্মার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হরিবর্মা বর্ম সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং বিক্রমপুর হতে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রামচরিত হতে জানা যায় পালরাজা রামপালের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হরিবর্মার একটি তাম্রশাসন সামন্তসার গ্রাম হতে উদ্ধার করা হয়েছে। তাম্রশাসনটি এমনভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে যে এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তাই হরিবর্মার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি। তার প্রধানমন্ত্রী ভবদেবভট্টের ভূবনেশ্বর প্রশস্তিতে হরিবর্মার উল্লেখ করেছেন। এতে হরিবর্মার শাসনকাল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলেও নিজ প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ভবদেব নিজে একজন ভালো যোদ্ধা ছিলেন। হরিবর্মা ও তাঁর পুত্রের পর জাতবর্মার আরেক পুত্র সামলবর্মা সিংহাসনে আরোহন করেন। সামলবর্মার রাজ্যশাসনের বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবে বৈদিক কুলজী গ্রন্থ হতে জানা যায় সামলবর্মার আমন্ত্রণে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বাংলায় আসেন। হরিবর্মাই প্রথম বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাংলায় নিয়ে আসেন এই তথ্য অন্য আরেকটি কুলজী গ্রন্থ হতে জানা যায়। তবে যে শাসকই বংগে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনয়নের ব্যবস্থা করেন না কেন বর্ম রাজবংশের ইতিহাসের সাথে তাদের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামলবর্মার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভোজবর্মা সিংহাসনে আরোহন করেন। বেলাব তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের পঞ্চম

Dhaka University Institutional Repository

বৎসরে বিক্রমপুর হতে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এ থেকেই বুঝা যায় তিনি সার্বভৌম শাসক ছিলেন। ভোজবর্মার পর বংগে বর্মবংশের আর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় নি।

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বংগে বিজয় সেন বর্ম রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে সেন রাজবংশ নামক এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু দক্ষিণ-পূর্ব বংগে বর্ম শাসনের অবসান ঘটাননি বরং উত্তর পশ্চিম বংগে পাল শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমস্ত বাংলায় সেন বংশের পত্তন করেছিলেন। বিজয় সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন[৪৫] হতে জানা যায় সামন্তসেন স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তিনি কোন সম্মান সূচক উপাধি ও গ্রহণ করেন নি। হেমন্তসেন সর্বপ্রথম মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ তিনিই ছিলেন এ বংশের প্রথম রাজা।[৪৬] বিজয়সেন এ রাজবংশকে সামন্তরাজ বংশ হতে স্বাধীন রাজবংশে পরিণত করেন। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসন ও দেওপাড়া শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে।[৪৭] তাম্রশাসন অনুযায়ী তিনি মোটামুটি ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৬০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি পালরাজ বংশের দু:সময়ে পালরাজা রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সহায়তা করেছিলেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপি প্রশস্তি হতে জানা যায় রামপাল প্রতিদান স্বরূপ বিজয়সেনকে রাঢ় এলাকায় স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে বিজয়সেন বর্ম রাজাদের নিকট হতে দক্ষিণ-পূর্ব বংগ জয় করে নিয়ে সমস্ত বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। তাঁর ব্যারাকপুর তাম্রশাসন চন্দ্র ও বর্ম বংশের রাজধানী বিক্রমপুর হতে প্রকাশিত হয়।[৪৮] বিক্রমপুরে তিনি সেন রাজবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পুত্র বল্লাল সেন বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন (১১৫৮-১১৭৮)। বল্লাল সেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে নৈহাটিতে। ভাগলপুর জেলার সনোখার গ্রামে একটি অষ্টধাতু নির্মিত সূর্য মূর্তির ধাতুময় আবরণের উপর খোদাইকৃত একটি লিপি এবং তাঁর রচিত অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর নামক গ্রন্থ দুটি হতে তাঁর রাজত্বকাল ও রাজ্যশাসন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া বল্লালচরিত হতে জানা যায় তিনি পিতার জীবদ্দশায় মিথিলা জয় করেছিলেন। বল্লাল সেনের মিথিলা জয় সম্পর্কে অধ্যাপক আব্দুল মমিন চৌধুরী ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে বল্লালসেন পিতার জীবদ্দশায় মিথিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ঠিকই তবে মিথিলা সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহ রয়েছে।[৪৯] তিনি সমগ্র রাজ্যকে কতগুলো ভুক্তিতে বিভক্ত করে উপযুক্ত শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তার শাসন আমলের পূর্বেও এ ধরণের ব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল। রাজা বল্লাল সেন বংলায় কৌলিন্য প্রথা প্রচলনের জন্য স্মরনীয় হয়ে আছেন। ১৯১১ সালে সীতাহাটির জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাপ্ত তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে বিক্রমপুর বিজয় সেনের আমল হতে রাজধানী ছিল এবং আদি সেন রাজাগণ রাঢ়দেশে রাজত্ব করতেন। সেন শাসকরা শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিক্রমপুরের পুরাপাড়া গ্রাম হতে একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন যা বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত আছে।[৫০] এ সময় এ ধরণের মূর্তি তৈরীর জন্য রাজশাহীর ধীমান ও বীতপালের মত বিক্রমপুরে ও একটি শিল্পীসংঘ গড়ে উঠেছিল। এসব শিল্পীরা বিক্রমপুর নগরীর আশেপাশেই বসবাস করত। বল্লাল সেন হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য উড়িষ্যা, মগধ, ভুটান, নেপাল, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় দূত প্রেরণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। বল্লাল সেন বাংলা প্রায় আঠার বৎসর শাসন করেছিলেন এবং রামপালে তার রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বল্লালসেন পুত্র লক্ষণসেনের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করলে লক্ষণসেন সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেন। তার শাসন আমলের আটটি তাম্রশাসন এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তার মধ্যে ছয়টি তাম্রশাসনই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষণসেন পিতামহ বিজয়সেনের সাথে গৌড় বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এসময় গৌড়রাজ্যের কিছু অংশ সেনরাজ্যভুক্ত হলেও সম্পূর্ণ গৌড়রাজ্য পাল রাজাদের অধীনে ছিল।[৫১]এসময়ও পাল রাজা গৌড়রাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে হয়ত লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ গৌড়রাজ্য জয় করেছিলেন এবং গৌড়ের রাজধানীর নাম হয়েছিল লক্ষণাবতী। তিনি সেন রাজাদের মধ্যে প্রথম যিনি বাহুবলে গৌড়জয়ের পর গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষণসেন বারাণসী, পুরী ও প্রয়াগ জয় করে সেথায় জয়স্ত ম্ভ স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুটি লিপি হতে জানা যায় তিনি গাহড়বাল রাজা জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সফলতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী লক্ষণসেনের গাহড়বাল জয়ের সফলতা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে লক্ষণ সেনের সমসাময়িক গাহড়বাল রাজ জয়চন্দ্র অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। উত্তর বিহার ও মগধের পশ্চিমাংশ এবং প্রয়াগও জযচন্দ্রের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সুতরাং কাশী ও প্রয়াগে লক্ষণ সেনের সমরস্তম্ভ ছিল এ মত গ্রহণযোগ্য নয়।[৫২]

লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের সাতাশ বৎসরে ভাওয়াল ও মাধাইনগর নামক দুটি তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই দুটি তাম্রশাসন হতে জানা যায় লক্ষণ সেন গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্রদ্বয়ও এই

Dhaka University Institutional Repository

উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষণ সেনের শাসন আমলের প্রথম দিকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে গৌড়েশ্বর উপাধি অনুপস্থিত ছিল। তাই অধ্যাপক আব্দুল মমিন চৌধুরীর মতে, "মুসলিম আক্রমণের ফলে গৌড়াঞ্চল হাতছাড়া হওয়ায় বা হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হলে এই গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণের প্রবনতা শাসকদ্বয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।"[৫৩] বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন যাঁরা কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করত তাদের কর্তৃক গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ বা তাদের তাম্রশাসনে সেনরাজার জন্য এই উপাধির ব্যবহার এই কথাই প্রমাণ করে যে গৌড়াঞ্চল হাতছাড়া হওয়ার পর পূর্ব গৌরব বজায় রাখা ও ঘোষণা করার ইচ্ছার তাড়নায় এই উপাধির ব্যবহার। তার মতে, গোবিন্দপাল ও পলপাল এ কারণেই গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। একাদশ শতাব্দী হতেই মুসলিমদের উপুর্যপুরি আক্রমণে ভারতবর্ষের হিন্দু রাজারা পর্যদুস্ত হতে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায়ই বংগে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজী বাংলার উত্তর পশ্চিমাংশ আক্রমণ করেন এসময় সেনরাজ লক্ষণসেন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন সিরাজ নদীয়াকে বংলার রাজধানী বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] কিন্তু এ ধারণা সত্য নয় বাংলার রাজধানী তখনও বিক্রমপুরই ছিল। গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত নদীয়া ছিল তীর্থস্থান এবং সাময়িক রাজধানী। বখতিয়ার খলজির অতর্কিত আক্রমণে রাজা হতভম্ব হয়ে যান এবং নদী পথে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। বখতিয়ার খলজি রাজার পশ্চাদ্বাবন না করে নদীয়া জয় করে লক্ষণাবতীর দিকে অগ্রসর হন এবং বিনাবাধায় তিনি লক্ষণাবতী জয় করেন। এসময় উত্তর বাংলায় হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে এবং মুসলিম শাসকরা স্বাধীনভাবে

Dhaka University Institutional Repository

শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব বংগে হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকে। রাজা লক্ষণসেন খুব সম্ভবত ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। লক্ষণসেনের মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন সিংহাসনে আরোহন করেন। এই দুই রাজার নাম তাম্রশাসনে পাওয়া গেছে।[৫৫] তাদের মধ্যে কে আগে সিংহাসনে আরোহন করেন তা জানা যায় নি। তাদের মধ্যে বিশ্বরূপ সেন বৃষভশংকর গৌড়েশ্বর ও কেশবসেন অরিরাজ অসহ্য শংকর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাদের তাম্রশাসন হতে বিক্রমপুরের দক্ষিণ অংশের সমুদ্র তীরে ভূমি দানের কথা জানা যায়। তাদের ভূমিদান থেকে বুঝা যায় তারা দক্ষিণ-পূর্ব বংগে নিজ আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই উভয় সেন রাজাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। যা তাদের তাম্রশাসন হতে জানা যায়। তাম্রশাসনে তাদের 'যবনান্বয়- প্রলয়-কালরুদ্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। উত্তর বাংলায় মুসলিমরা স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণ-পূর্ব বংগ জয় করার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তারা নৌ অভিযানে ততটা পারদর্শী ছিলেন না। বিশ্বরূপসেন ও কেশব সেন যখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দীন। এরপর সেন সিংহাসনে কে আরোহন করেছিলেন পরিষ্কার ভাবে জানা না গেলেও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে কুমার সূর্যসেন ও পুরুষোত্তম সেনের নাম পাওয়া যায়।[৫৬] এদের মধ্যে কে আগে রাজত্ব করেছিলেন তা পরিষ্কার ভাবে জানা যায় নি। বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের চল্লিশ বৎসর পর ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন সিরাজ লক্ষণাবতীতে (১২৪৪-৪৫খ্রিঃ) আগমন করেন। তিনি তার তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে লক্ষণ সেনের বংশধরগণ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৫৭] তবে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

শাসনকাল শাসনব্যবস্থা বা শাসকদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। অধিকাংশ পন্ডিতের মতে সেনরাজারা মোটামুটি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বংগ শাসন করেছিলেন এবং তাদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেন শাসনের অবসানের পর দেব রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে ছিল বলে পন্ডিতগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। বিক্রমপুরের আদাবাড়ী গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হতে দশরথদেব নামক একজন হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায়।[৫৮] তার তাম্রশাসন বিক্রমপুর নগরী হতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই তাম্রশাসনটি এতবেশী জীর্ণ ছিল যে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। যেটুকু পাঠোদ্ধার করা গেছে তা হতে জানা যায় তিনি সেনরাজাদের মতো পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজ অরিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তাম্রশাসন হতে জানা যায় তিনি নারায়ণের কৃপায় গৌড়রাজ্য লাভ করেছিলেন। এই দেব রাজবংশই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতে এসময় গৌড়ে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দীন বারানীর মতে দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন তুঘরল খান। তুঘরল খান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে গিয়াসউদ্দীন বলবন তাকে দমনের জন্য নিজেই সৈন্যবাহিনী সহ বাংলায় আসেন এবং তুঘরলিকে দমনের জন্য সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা রাজা দনুজরায়ের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত সুবর্ণ গ্রামের নাম পাওয়া যায়।[৫৯] চন্দ্র বংশের রাজা শ্রীচন্দ্রের সময় হতে কেশবসেনের সময় পর্যন্ত বিক্রমপুরই

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববংগের রাজধানী ছিল। দশরথদেবের তাম্রশসানেও বিক্রমপুরকেই রাজধানী বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দীন বারানী তাকে সর্বপ্রথম সুবর্ণ গ্রামের রাজা বলে উল্লেখ করেছেন।[৬০]এই সময় হতে মুগল আমল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সোনারগাঁও ইতিহাসে স্থান পেয়েছে এবং বিক্রমপুরের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়েছে। ঠিক কোন সময় হতে বিক্রমপুর নগরীর মর্যাদা হারাতে থাকে তা স্পষ্ট ভাবে জানা না গেলেও একথা বলা যায় যখন থেকে ইতিহাসে সুবর্ণ গ্রাম মর্যাদা লাভ করে তখন থেকেই বিক্রমপুরের প্রাধান্য বিলুপ্ত হতে থাকে। মুসলিম শাসনামলের পুরো সময়টাই বিক্রমপুর সোনারগাঁয়ের পরগনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিক্রমপুরের ইতিহাস রচয়িতা যোগেন্দ্রনাথগুপ্ত পূর্ববংগের সমসাময়িক দুজন নৃপতির নাম উল্লেখ করেছেন। তার মতে সেন বংশের মধুসেন গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত ছিল এবং অপরজন দনুজমাধব দশরথদেব। এসময় গৌররাজ্য সম্ভবত পূর্ববংগেই সীমাবদ্ধ ছিল। গৌড়ে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় রাজাই যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সেন রাজাকে পরাজিত করে গৌড়ে দশরথদেব নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

ত্রয়োদশ শতব্দীর শেষার্ধে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব বংগে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পৌত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউসের মুদ্রায় সর্বপ্রথম বংগ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ১২৯১ হতে ১৩০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব বংগের কিছু অংশ তিনি জয় করে নেন বলে ধারণা করা হয়।[৬১] এই সময়ে দিল্লীতে খলজী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার শাসনকার্য বলবন শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। রুকনউদ্দীন কায়কাউসের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই শামসউদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

ফিরূজ শাহ লখনৌতির সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৩০১-১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে লখনৌতি ও সোনারগাঁ টাকশাল হতে প্রচলিত অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাঁর সময়ে সিলেটও মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। শামসউদ্দীন ফিরুজশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর লখনৌতির সিংহাসনে আরোহন করেন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ত্রিহুত জয়ের পর তার পালক পুত্র বাহারাম খানকে লখনৌতির বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। যুদ্ধে গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর পরাজিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় পলায়নের সময় পথিমধ্যে নিহত হন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সাতগাঁও, সোনারগাঁ ও লখনৌতিতে প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে সোনারগাঁয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখনৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ-এই তিনটি অঞ্চলের উপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর শাহ-ই-বাংগালা উপাধি ধারণ করেন এবং সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করেন। ফলে বিক্রমপুর নগরী শাসকদের অবহেলা এবং পদ্মা নদীর করাল গ্রাসে ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়ে। ইলিয়াস শাহী শাসনের অবসানের পর বাংলায় হোসেনশাহী শাসন আমলের উত্থান ঘটে। ইলিয়াস শাহী ও হোসেনশাহী আমলে বিক্রমপুর নগরীর আলাদা কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় নি। এসময় বিক্রমপুর সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল হিসেবে ভূ-স্বামীদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তী ইলিয়াস শাহী শাসন আমলে জালালউদ্দীন ফতেহ শাহের সময় বিক্রমপুরের রামপালে বাবা আদম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬২] নদী বেষ্টিত বিক্রমপুরে নদীর আক্রমণে

Dhaka University Institutional Repository

এতবেশী ভাংগা গড়ার খেলা চলে যে এক সময়ের জনবসতিপূর্ণ অনেক অঞ্চলই নদী গর্ভে চলে গেছে। আবার যে এলাকাটিতে পূর্বে নদী ছিল তা বর্তমানে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। শেরশাহ হোসেন শাহী বংশের শেষ শাসক গিয়াসউদ্দীন মাহমুদকে পরাজিত করে বাংলায় প্রায় দুশো বৎসরের স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসান ঘটান। তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বংলাকে বহু ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে সুশাসক নিয়োগ করেন। এসময় বিক্রমপুর কাজীদের দ্বারা শাসিত হত। শেরশাহের শাসন আমলে সোনারগাঁয়ে গ্রান্ড ট্রাংক রোড নির্মিত হয়। বাংলা শুর শাসকদের দ্বারা মোটামুটি ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসিত হয়। এরপর বাংলায় কররাণী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় দিল্লীতে পুনরায় ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয় এবং মুগল শাসকরা পুনরায় দিল্লী শাসন করতে থাকে। দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট আকবর। বাংলার শাসনকর্তা সুলায়মান কররাণীর শাসন আমলে বিক্রমপুরের রিকাবীবাজারে একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়।[৬৩] বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসান এবং মুগল আমলের সূচনা পর্বে বাংলার রাজধানীর পরিবর্তন ঘটে। সোনারগাঁ হতে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রশাসনিক বিভাগেরও পরিবর্তন ঘটে এবং বিক্রমপুরের মত সোনারগাঁও পরগনার মর্যাদা লাভ করে। বিক্রমপুর হিন্দু প্রধান অঞ্চল হিসেবেই সবসময় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বাংলায় মুসলমান শাসন সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই অঞ্চলেও ধীরে ধীরে মুসলিম বসতি বৃদ্ধি পায়। বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে সেই সময়ে নির্মিত মসজিদ হতে এই মতের সত্যতা মেলে। সম্রাট আকবরের সেনাপতি মুনিম খান বাংলার শাসক দাউদ খানকে পরাজিত করে বাংলায় মুগল আধিপত্য কায়েম করেন ১৫৭৫ সালে। সম্রাট আকবরের শাসন আমলে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সুবায় পরিণত হয়। বাংলার সুবাদার রাজা টোডর মল রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি সমগ্র বাংলাকে উনিশ সরকার ও ছয়শ বিরাশি পরগনায় বিভক্ত করেছিলেন। বঙ্গ দেশের জমি তৎকালে খালসা নামে অভিহিত ছিল। বিক্রমপুর সরকার সেসময় সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত একটি মহাল ছিল। সোনারগাঁয়ের বাহান্ন মহালের মধ্যে বিক্রমপুর মহালের রাজস্ব আয় ছিল সর্বাধিক।[৬৪] সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলায় ভুঁইয়া বা জমিদার শ্রেনীর উদ্ভব ঘটেছিল। ভুঁইয়া বা জমিদাররা মুগল শাসনের অধীনতা অস্বীকার করে রাজস্ব প্রদানে বিরত থাকে। এসব স্বাধীন ভুঁইয়ারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাদের পরাজিত করে বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করতে মুগল শাসকদের অনেক সময় লেগেছিল। এসব ভুঁইয়াদের নেতা ছিলেন ইসা খাঁ। বিক্রমপুরের ভুঁইয়া চাঁদ রায়, কেদার রায় নিজেদের স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণা করে। এসময় শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারো ভুঁইয়ারা ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলীর নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে শক্তিশালী মুগল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। সুবাদার হিসেবে রাজা মানসিংহের বাংলায় নিযুক্তি বাংলার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিক্রমপুর হতে বার মাইল দূরে এক স্থানে মানসিংহ ঈসাখাঁ ও মাসুম খান কাবুলীর সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবেলা করেন। এই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র নিহত হয় এবং মানসিংহ ঈসাখাঁর সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। ঈসাখাঁ মুগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। ঈসাখাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান বার ভুঁইয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । বারো ভুঁইয়াদের আক্রমণে মুগল বাহিনী বিভিন্ন স্থানে বিপর্যস্ত হতে থাকলে রাজা মানসিংহ পুনরায় বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। বিক্রমপুরের কাছে এক যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও বন্দী

Dhaka University Institutional Repository

করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এসময় মানসিংহ দূত মারফত সংবাদ পাঠান যে রানী যুদ্ধ বন্ধ করে মুগল শাসকের অধীনতা স্বীকার করে নিলে বিক্রমপুরের উপর তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। রানীর উপরই সমস্ত রাজ কর্যের দায়িত্ব থাকবে। রানী মানসিংহের প্রস্ত াবে সম্মত হয়ে মুগল আনুগত্য স্বীকার করে নিলে বিক্রমপুরের স্বাধীনতা চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে গেল।[৬৫] রানী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই বিক্রমপুর শাসন করেন। রানীর মৃত্যুর পর মুগল রাজপ্রতিনিধির আদেশ অনুসারে চাঁদরায়, কেদার রায়ের জমিদারী তার মন্ত্রীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে মুগল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র জাহাঙ্গীর মুগল সিংহাসনে আরোহন করেন। মানসিংহের পর কুতুবউদ্দীন বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। তিনি শের আফগানের হাতে নিহত হলে জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। জাহাঙ্গীর কুলীর মৃত্যুর পর ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। সুবাদার ইসলাম খান অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমেই রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের সাথে মুগলদের যুদ্ধ শুরু হয়। মুগল বাহিনী অতর্কিত হামলা চালিয়ে মুসা খানের দুর্ভেদ্য দুর্গ কাটরাবো দখল করে নেন।[৬৬] এভাবে ইসলাম খান বাংলার বারো ভুঁইয়াদের দমন করে মুগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সম্রাট জাহাংগীরের নাম অনুসারে ঢাকার নাম দেন জাহাংগীরনগর।[৬৭]

মীরজুমলা যখন বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন তখন বাংলার পর্তুগীজ, মগ, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের উপদ্রব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উপদ্রব মোকাবেলার জন্য তিনি প্রাচীন দুর্গাদি সংস্কার করেন এবং বিক্রমপুরের ইদ্রাকপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সমসাময়িক কালে মীর কাদিম

Dhaka University Institutional Repository

নামক স্থানে একটি দীর্ঘ পুল নির্মিত হয়েছিল। সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসন আমলে বিক্রমপুরে ফিরিঙ্গিবাজার নামে একটি সমৃদ্ধ বাজার ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে বিক্রমপুরের পাথরঘাটায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ঢাকায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বিক্রমপুরে একটি ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় এখানে মুন্সি হায়দার নামক একজন ফৌজদার দায়িত্ব পালন করতেন। তার নাম অনুসারে এই এলাকার নাম হয় মুন্সিগঞ্জ।[৬৮] মুর্শীদকুলী খানের সময়ে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত অনুযায়ী বিক্রমপুর ছিল জাহাঙ্গীর নগর চাকলার অধীন।[৬৯] বারো ভুঁইয়াদের দমনের পর তাদের জমিদারীগুলো বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে সমগ্র এলাকায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের উদ্ভব ঘটে। কেদার রায়ের জমিদারী নওপাড়ার ভবদ্বার বংশীয় বৈদ্য চৌধুরীদের অধিকারে চলে যায়। বিক্রমপুরের কয়েকজন প্রতাপশালী জমিদারদের মধ্যে জঙ্গার রায়, সোনারং ও সমকোঠের ভূঞা, মালখানাগরের বসু পরিবার ইত্যাদি। এসব জমিদারদের আমলে বিক্রমপুরের অনেক মঠ ও মন্দির নির্মিত হয়েছে। বিক্রমপুরের অনেক স্থানেই এসব মঠ ও মন্দির এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। জাহাঙ্গীর নগরের সাথে বিক্রমপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার জন্য জমিদার রাজবল্লভ তালতলার খালের উপর পুল নির্মাণ করেছিলেন।[৬৯] ঔপনিবেশিক শাসন আমলে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জ নামক গ্রামে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭০] এভাবেই বিক্রমপুর নামটি ইতিহাসের বিবর্তনে লুপ্ত হয়ে যায় এবং মুন্সিগঞ্জ নামটি সরকারি দলিল দস্তাবেজ নথিপত্রে ও মানচিত্রে স্থান করে নেয়। অবশেষে ১৯৮৪ সালে[৭১] জেলা হিসেবে মুন্সিগঞ্জ আত্মপ্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মুন্সিগঞ্জের মসজিদ স্থাপত্য

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ অঞ্চলে চন্দ্র, বর্ম ও সেন শাসকরা পর্যায়ক্রমে স্বাধীনভাবে বিক্রমপুর হতেই রাজ্য শাসন করত। কয়েক শতাব্দী ধরে বিক্রমপুর ছিল এই রাজবংশ গুলোর রাজধানী। এই এলাকায় প্রাচীন বৌদ্ধ, শাসন আমলের অনেক শিলালিপি, মুদ্রা, মূর্তি ও ভাস্কর্য আবিস্কৃত হলেও এখন পর্যন্ত কোন স্থাপত্য ইমারতের সন্ধান পাওয়া যায় নি। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকে ফাহিয়েন এবং সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং বাংলায় প্রচুর স্তুপ, বিহার ও দেবমন্দির প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৭২] মূলত বাংলায় মুসলিম শাসনের পূর্বে গড়ে উঠা স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন খুব একটা পাওয়া যায় না।

বাংলার ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব হতেই বাংলায় মুসলিম সুফী সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে শাসক অপেক্ষা সুফী সাধকরাই প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বঙ্গ বিজয়ের পর মুসলিম শাসন আমলে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচুর মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, দরগাহ ইত্যাদি নির্মিত হয়। তাই সারা বাংলায় আমরা মধ্যযুগে নির্মিত ইমারতই বেশী প্রত্যক্ষ করি। বাংলায় প্রায় সাতশত বৎসর ধরে মুসলিমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ অনেক ইমারত গড়ে তোলে। এই অঞ্চলের শাসকরা প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করত এবং তাদের এই স্বাধীন সত্ত্বার বহি:প্রকাশ সেই সময়ে নির্মিত স্থাপত্যেও পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে মুসলিমদের দ্বারা গড়ে উঠা স্থাপত্যে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সাথে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

(মুসলিম) স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটায় মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

মধ্যযুগে বাংলায় গড়ে উঠা মুসলিম স্থাপত্য গুলোকে মূলত দুইভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে; ক. সুলতানী স্থাপত্য ও খ. মুগল এবং মুগল পরবর্তী স্থাপত্য। এসময়ে বাংলায় বিকশিত ইমারতসমূহ যেকোন একটি রীতি বা এই দুটি রীতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। বাংলায় সুলতানী আমলে নির্মিত স্থাপত্যে স্বাধীন সুলতানী শাসকদের স্বতস্ফুর্তভাব এবং ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানী স্থাপত্যে বাংলার নিজস্ব উপাদান এবং বাইরে থেকে আসা মুসলিমদের নির্মাণ উপাদানের সংমিশ্রণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ইমারত বিকাশ লাভ করে। আবহাওয়া ও পরিবেশগত কারণে এবং পাথরের স্বল্পতাহেতু বাংলায় গড়ে উঠা স্থাপত্য নির্মাণে ইটের প্রাধান্য বেশী। সুলতানী আমলে নির্মিত অনেক মসজিদ এবং সমাধিতে পাথরের ব্যবহার দেখা গেলেও তা খুবই সামান্য। সুলতানী আমলে গড়ে উঠা স্থাপত্যে যেসব বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলো অষ্টাভুজাকার ব্যান্ডযুক্ত পার্শ্ববুরুজ, স্থুলাকার অনুচ্চ স্তম্ভ, বক্রাকার কার্নিশ, অনুচ্চ গম্বুজ, দ্বি-কেন্দ্রিক সূঁচালো খিলান, বাংলার কুঁড়েঘরের চালাছাদের ন্যায় আচ্ছাদন এবং টেরাকোটা অলংকরণের ব্যবহার ইত্যাদি। বাংলার কুঁড়েঘরের চারকোণে চারটি শক্তিশালী গিঁটযুক্ত বাঁশের খুঁটির ব্যবহার হতেই মসজিদের চারকোণে ব্যান্ড নকশাযুক্ত বুরুজ নির্মাণ রীতির প্রচলন হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সুলতানী আমলের ইমারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কার্নিশের ধনুকবক্রতাও এসেছে মূলত কুঁড়েঘর থেকেই যা সুলতানী আমলের স্থাপত্যকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সুলতানী আমলে বহু গম্বুজযুক্ত মসজিদ তুলনামুলক ভাবে বেশী নির্মিত হয়েছে। এসময়ে নির্মিত স্থাপত্যে কিছুটা পারসিক নির্মাণ রীতির প্রভাব থাকলেও স্থানীয় নির্মাণ রীতির প্রতিফলনই বেশী ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে মুন্সিগঞ্জে যে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে তন্মধ্যে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ, আফগান শাসন আমলের একটি মসজিদ এবং বাকীগুলো মুগল ও মুগল পরবর্তী সময়ের। মুগল আমলে বাংলার শাসনভার সরাসরি দিল্লীর শাসনাধীনে চলে যাওয়ায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দ্বারা নির্মিত স্থাপত্যে স্বকীয়তার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। এসময় বাংলার স্থাপত্যে রাজকীয় মুগল স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায়। মুগল আমলে বিকশিত স্থাপত্যের সাথে সুলতানী আমলে নির্মিত স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এসময় গড়ে উঠা স্থাপত্যে দ্বি-কেন্দ্রিক খিলানের পরিবর্তে চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার, সুউচ্চ গম্বুজ নির্মাণ, গম্বুজ নির্মাণে ড্রামের ব্যবহার, সমান্তরাল কার্নিশ, টেরাকোটা অলংকরণের পরিবর্তে দেয়ালগাত্রে পলেস্তরা এবং পলেস্তরার উপর প্যানেল নকশা এবং ইমারতের চারকোণে কার্নিশের উপর পর্যন্ত উঠে যাওয়া বুরুজ যা ছত্রী দ্বারা আচ্ছাদিত ইত্যাদি মুগল আমলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে মুন্সিগঞ্জের পাথরঘাটায় নির্মিত হয়েছে একটি তিন গম্বুজ মসজিদ। অবশিষ্ট মসজিদগুলো মুগল পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত মসজিদগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. সুলতানী আমলের মসজিদ স্থাপত্য

বাবা আদম মসজিদ

(চিত্রঃ ১- ৫ ; ভূমিনকশাঃ ১)

বাবা আদম মসজিদ মুন্সিগঞ্জ জেলার রিকাবী বাজার ইউনিয়নের কাজী কসবা গ্রামে অবস্থিত মীর কাদিম থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে এবং বল্লাল বাড়ী থেকে এক মাইল উত্তর পশ্চিমে এই মসজিদটি অবস্থিত। উক্ত মসজিদটি গোয়ালগুন্নি মৌজায় অবস্থিত। মসজিদের মৌজা নং- ২৫, দাগ নং-২৭২।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমলে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের যে ধারা বিকশিত হয়েছিল তার পরিপূর্ণ রূপ বিকশিত হয় এই ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটিতে। পূর্বে এই মসজিদে কোন বেষ্টনী ছিল না। বর্তমানে স্থানীয় উদ্যোগে লোহার বেষ্টনী দেয়া হয়েছে। মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত হলেও মসজিদের কিছুকিছু সংস্কার[৭৩] কাজ মসজিদ কমিটির দ্বারাও সাধিত হয়েছে বলে জানা যায়।

এটি একটি আয়তাকার মসজিদ যার অভ্যন্তরীণ অংশের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১০.৩৫ মিটার এবং প্রস্থে ৬.৭৫ মিটার। এর বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য ১৪.৩০ মিটার এবং প্রস্থ ১১.৪৫ মিটার এবং দেয়াল ২ মিটার পুরু।[৭৪] দুটি স্তম্ভ এবং তিনটি খিলান পথ প্রার্থনা গৃহটিকে দুই 'আইল' এবং তিন 'বে' তে বিভক্ত করেছে।[৭৫] নামাজ গৃহে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে তিনটি কৌনিক খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথ গুলো আবার আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ অপেক্ষা কিছুটা বড়। প্রবেশ পথ বরাবর নামাজ গৃহের কিবলা প্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতির মিহরাব আছে এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষা বড়। মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি চিত্তাকর্ষক নকশায় অলংকৃত। আয়তাকার ফ্রেমে বহুখাঁজ বিশিষ্ট নকশাযুক্ত দ্বিকেন্দ্রিক খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। মিহরাবের দুই পার্শ্বে অলংকরণ যুক্ত দুটি স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়। খিলানটি দুই পার্শ্বে দুটি অলংকৃত স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে। আয়তাকার প্যানেলে একসারি বরফী নকশা তার নীচে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া প্রধান মিহরাবে ফুলেল নকশাও দেখা যায়। পার্শ্ববর্তী স্তম্ভ গুলোতে ফুল, লতা-পাতার টেরাকোটা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রধান মিহরাবের ভিতরের অংশে ঝুলন্ত শিকলঘন্টা নকশা লক্ষ্য করা যায়। পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ হলেও প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

মিহরাবের মতো এত বেশী অলংকৃত নয়। এগুলোতেও ফুল, লতা-পাতার টেরাকোটা অলংকরণ দেখা যায়। এধরণের অলংকৃত মিহরাব শাহজাদপুর মসজিদে এবং বারো বাজারের গলাকাটা মসজিদে পরিলক্ষিত হয়।

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে একটি করে গভীর কুলঙ্গি আছে। নামাজ গৃহের অভ্যন্তরে দুটি কালো ব্যাসাল্ট পাথরের স্তম্ভ প্রোথিত আছে যার ভিত অষ্টকোণাকার এবং স্তম্ভ গাত্র ষোলকোণাকৃতির। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দেয়াল গাত্রে দুটি করে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়াল গাত্রে একটি করে মোট ছয়টি সংযুক্ত স্তম্ভ রয়েছে। এই স্তম্ভগুলোর উপর থেকে কৌনিক খিলান উত্থিত হয়েছে। এই উত্থিত খিলানের উপর ছয়টি গোলাকৃতির গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজগুলো নির্মাণে পেনডেনটিভ রীতি অনুসৃত হয়েছে।

কিবলা দেয়ালের কেন্দ্রীয় মিহরাবের বহির্ভাগে তিনটি উদগত অংশ আছে। কেন্দ্রীয় অংশটিতে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ বহু খাঁজ বিশিষ্ট একটি খিলান নকশা যেখানে একটি ঝুলন্ত শিকলঘন্টা নকশা পরিলক্ষিত হয়। এই মসজিদ নির্মাণে ইট, চুন, সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। কিবলা প্রাচীরের মিহরাব গুলো ব্যতীত অভ্যন্তর ভাগের অবশিষ্ট দেয়ালগুলো অলংকরণহীন। মসজিদ গৃহের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বাতি রাখার জন্য একটি করে কুলঙ্গি রয়েছে। কুলঙ্গিগুলো আকারে ক্ষুদ্র এবং কৌনিক খিলান সহযোগে গঠিত।

এই মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে দুটি আয়তাকার প্যানেল এবং প্যানেলের ভিতর বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান পরিলক্ষিত হয়। আয়তাকার প্যানেলে একসারি বরফী নকশা এবং তার নিচে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা, খিলানের স্প্যানড্রিলের দুই পাশে দুটি রোজেট এবং একসারি ফুল, লতা-পাতা নকশা দ্বারা অলংকৃত স্তম্ভ। খিলানের অভ্যন্তরে দেয়াল গাত্রে সুলতানী আমলের ঐতিহ্যবাহী শিকলঘন্টা নকশা দেখা যায়। কালো পাথরের শিলালিপিটি কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপরে প্রোথিত আছে। মসজিদের

Dhaka University Institutional Repository

বহির্ভাগের চারকোণে চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ বিদ্যমান এবং বুরুজগুলো বাংলার গৃহ নির্মাণের অত্যাবশকীয় উপকরণ বাঁশের মত গিঁট বা ব্যান্ড যুক্ত। ব্যান্ডগুলোতে বিভিন্ন ফুলেল, টেরাকোটা নকশা পরিলক্ষিত হয়। বুরুজগুলো ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। এই মসজিদের কার্নিশটি বক্রাকার যা সুলতানী আমলের একটি বৈশিষ্ট্য। বক্রাকার কার্নিশের নীচে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা রয়েছে এবং মারলনের মধ্যে ফুল, লতা-পাতার টেরাকোটা নকশা পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের বহির্দেয়ালে অলংকরণ শাহজাদপুর মসজিদেও দেখা যায়।

মসজিদের অভ্যন্তরে গম্বুজের নিম্নাংশে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। একই ধরণের বদ্ধ মারলন নকশা মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমেও দেখা যায় যা মসজিদের অলংকরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নামাজ গৃহের অভ্যন্তরে কালো ব্যাসাল্ট পাথরের স্তম্ভ দুটির শীর্ষে এবং স্তম্ভগাত্রে শিকলঘন্টা নকশা পরিলক্ষিত হয়।

এই ধরণের আয়তাকার ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট বেশকিছু মসজিদ সুলতানী এবং মুগল আমলে বাংলায় নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে সুলতানী আমলে নির্মিত নারায়ণগঞ্জের মুয়াজ্জামাপুর মসজিদ (১৪৩৫-৩৬), চট্টগ্রামের হাটহাজারী মসজিদ (১৪৭৪-৮১), বাগেরহাটের রেজাখোদা মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮) এবং বারোবাজরের গল্লাকাটা মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), মুগল আমলে নির্মিত চট্টগ্রামের মোল্লা মিসকিন শাহ মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ সুলতানী আমলেই অপেক্ষাকৃত বেশী নির্মিত হয়েছে। মসজিদের নির্মাণশৈলী দেখে মনে হয় এতে সুলতানী আমলের প্রথম দিকে নির্মিত ইমারতসমূহের ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন হয়েছে। সুলতানী আমলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যে বিকশিত চূড়ান্ত রূপটি বাবা আদম মসজিদে পূর্ণতা লাভ করেছে। মসজিদ নির্মাণে ইটের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও স্তম্ভদুটো কালো ব্যাসাল্ট পাথরের। এ থেকে বুঝা যায় বাংলায় পাথরের স্বল্পতাহেতু ইট প্রায় সার্বজনীন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাথরের স্তম্ভগুলো খুব সম্ভবত পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত কোন ইমারত হতে সংগৃহীত। বক্র কার্নিশ দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার অষ্টভুজাকার বুরুজ, গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতি, চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ টেরাকোটা অলংকরণ মসজিদটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সুতরাং বলা যায় সুলতানী আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের বিকশিত পূর্ণ রূপটি এই মসজিদে দেখা যায়।

মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় সুলতান ফতেহ শাহের রাজত্ব কালে ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে মালিক কাফুর কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। শিলালিপিটি নিম্নরূপ:

Allah, the most high says, "surely the mosques belong to Allah, so do not call any one with Allah". The Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has said, ' He who builds a mosque in the world, Allah builds for him a palace in heaven". This jami mosque was built by the great governor Malik, Malik Kafur, in time of the Sultan, son of the Sultan, Jalal-al-Dunya wal- Din Abul Muzaffar Fath Shah, the Sultan, son of Mahmud Shah, the sultan, on a date, in the middle of Rajab in eight hundred and eighty- eight (August 1483 A.D.).[৭৬]

মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন, নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য অতএব আল্লাহর সাথে কাহাকেও অংশীদার করো না। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে একটি মসজিদ তৈরী করে

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহতা'য়ালা তার জন্য বেহেশতে একটি অট্টালিকা তৈরী করেন। এই মসজিদটি সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে ৮৮৮ হিজরি অনুসারে ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[৭৭]

মুন্সিগঞ্জের যে কয়েকটি স্থাপত্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত তার মধ্যে বাবা আদম মসজিদ অন্যতম। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এই মসজিদটিকে ভগ্ন অবস্থায় পেয়েছিল। পরবর্তীতে মসজিদটি এই অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার করা হয়। বাবা আদম মসজিদের সংরক্ষণ নম্বর ৪৩৯৪২. অ এবং তারিখ ৪-৩-১৯২৯। বর্তমানে এই মসজিদটিতে নিয়মিত মুসুল্লিরা নামাজ পড়েন। যদিও মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত তথাপি স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে মসজিদের ছোট ছোট সংস্কার কার্য সহ সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বাবা আদম মাজার

বাবা আদম মসজিদের পাশেই রয়েছে বাবা আদমের[৭৮] মাজারটি অবস্থিত। ইতিহাসের কিংবদন্তির বাবা আদমের নাম অনুসারে মসজিদ ও মাজারের নামকরণ এরূপ করা হয়েছে। কথিত আছে বাংলায় মুসলিম শাসকদের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব থেকেই সুফী সাধকরা ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। বাবা আদম এবং তাঁর অনুসারীরা তৎকালীন বিক্রমপুরে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। সেসময় বাংলার শাসক ছিলেন রাজা বল্লাল সেন। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় বাবা আদম ও তাঁর অনুসারীরা রাজা বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন। একটি কাক এক টুকরা গরুর মাংস রাজপ্রাসাদের প্রাচীরে ফেললে রাজা ক্ষিপ্ত হন এবং চারদিকে দূত প্রেরণ করেন অপরাধীর খোঁজে। দূত মারফত সংবাদ পান রাজপ্রাসাদের অদূরে একজন মুসলিম নামাজ পড়ছেন। তিনি সেখানে যান এবং নামাজরত অবস্থায় বাবা আদমকে হত্যা করেন। এই তথ্যের পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বাবা আদমকে মসজিদের দক্ষিণ-পূর্বে সমাধিস্থ করা হয়। পূর্বে কবর খোলা জায়গায় ছিল। বর্তমানে কবরকে কেন্দ্র করে নতুন একটি মাজার নির্মাণ করা হয়েছে। এই মাজারটির পরিমাপ ২৫মিটার × ২৫ মিটার। মাজার কবে নির্মাণ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোনো শিলালিপি নেই। বাবা আদমের মাজার একটি সাধারণ ইমারত। এই ইমারতের কোনো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নেই।

বার আউলিয়ার মাজার

(চিত্র : ৬)

মুন্সিগঞ্জ জেলার মহাকালী ইউনিয়নের কেওয়ার গ্রামে বার আউলিয়ার মাজার শরীফ অবস্থিত।[৭৯] স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা নির্মিত মাজার গায়ে প্রোথিত ফলক হতে জানা যায় (৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে) ৪২১ হিজরি সনে সুদূর আরব দেশ হতে বার জন আউলিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দু অধ্যুষিত বিক্রমপুরের উক্ত স্থানে আসেন। উক্ত স্থানটি তৎকালীন সময়ে কালীদাস সাগর নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে স্থানটি ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়। এই বার জন আউলিয়া স্থানটি পরিষ্কার করেন। ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে স্থানটিতে ইবাদতখানা, ইমারত এবং দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা এখানেই মৃত্যুবরন করেন। বাংলায় মুসলিম শাসকদের আগমনের বহু পূর্বেই এ অঞ্চলে সুফী সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই বার জন সুফী সাধক বিক্রমপুরের বাবা আদম (রা:) এর সমসাময়িক। পরবর্তীতে এই সাধকদের বাসস্থান ঘন জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গেলে হযরত খাজা সৈয়দ হাফেজ মোহাম্মদ হোসাইনী চিশতি (রহ:) ওরফে পাঞ্জাবী হুজুরের নির্দেশে সৈয়দ মোহাম্মদ আল কাদরী শাহ এই বার জন আউলিয়ার মাজারসমূহ সংস্কার করেন। মাজার সংস্কারের সময় একজন আউলিয়ার কবর হতে ফার্সী ও আরবী ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। বস্তুত আদি শিলালিপিটি

Dhaka University Institutional Repository

কারপক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি। সম্প্রতি মাজারের গায়ে বার জন আউলিয়ার নাম লেখা পাথরের ফলক স্থাপন করা হয়েছে। মাজারের নিজস্ব একটি পুকুর, একটি মসজিদ এবং একটি দোকান আছে। মাজারের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাইশ সদস্যের একটি কমিটি আছে। এছাড়া মধ্য কেওয়ার গ্রামে আরেকটি মাজার আছে। এটি মাজারটি সৈয়দ হাফেজ সেখদার হোসাইনী বলখী (রহঃ) এর। তিনিও অনেক পূর্বে বিক্রমপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য অসেন বলে একটি ধারণা এখানে প্রচলিত আছে। এসব ধারণা গ্রহণের জন্য আরো প্রমাণ যোগ্য তথ্যের প্রয়োজন আছে।

টেঙ্গোরশাহী মসজিদ

(চিত্রঃ ৭-৮ ; ভূমিনকশাঃ ২)

মুন্সিগঞ্জ জেলা শহর থেকে ৪.৮ কিলোমিটার পশ্চিমে রিকাবী বাজার ইউনিয়নের টেঙ্গোর গ্রামে টেঙ্গোরশাহী মসজিদটি অবস্থিত। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে এটি গ্রামের নাম অনুসারে টেঙ্গোরশাহী মসজিদ নামেই পরিচিত।

টেঙ্গোরশাহী মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট এবং ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার। এই মসজিদটির অভ্যন্তরীণ অংশের পরিমাপ ৬.৯৫ মিটার x ৬.৯৫ মিটার এবং এর দেয়াল ২.১৩ মিটার পুরু।[৮০] মসজিদের পূর্ব দিকের ফাসাদে তিনটি অনুচ্চ প্রবেশ পথ আছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ অপেক্ষা কিছুটা প্রশস্ততর। প্রবেশ পথগুলোতে দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়; যা সুলতানী স্থাপত্য রীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক প্রবেশ পথ সংস্কারের কারণে দেয়ালের বাহিরের দিক বর্তমানে সমতল এবং ভেতরের অংশে দ্বিকেন্দ্রিক খিলান দৃষ্টি গোচর হয়। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে তিনটি করে প্রবেশ পথ ছিল। বর্তমানে উত্তর এবং

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি জানালায় রূপান্তর করা হয়েছে ও পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম দিকের দেয়ালে প্রবেশ পথ বরাবর তিনটি মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব গুলো অপেক্ষা প্রশস্ততর। কেন্দ্রীয় মিহরাবে বহুপত্রযুক্ত খিলান পরিলক্ষিত হয়। খিলানটি পার্শ্ববর্তী দেয়াল সংলগ্ন স্তম্ভ হতে উত্থিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী মিহরাব গুলো বর্তমানে কোরআন শরীফ রাখার সেলফ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রার্থনা গৃহের চারকোণে চারটি স্থূলস্তম্ভ আছে। *Archaeological Survey Report Munshiganj District* প্রতিবেদনে এই মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজের উল্লেখ রয়েছে[৮১] যা সঠিক নয়। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে এই মসজিদের চারকোণে চারটি স্থূলাকার স্তম্ভ[৮২] দেখা যায় যা সুলতানী স্থাপত্য রীতির একটি বৈশিষ্ট্য। স্তম্ভগুলোর আয়তন ১.৪০মিটার x ১.৪০ মিটার। মসজিদের প্রত্যেক দেয়ালে দুটি করে সংলগ্ন স্তম্ভ আছে। বর্গাকার ইমারতটিকে বৃত্তে রূপান্তরের জন্য অবস্থান্তরের পর্যায়ে একসারি খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। খিলানের ফাঁকা ত্রিকোন অংশ পূরণের জন্য মৌচাকের ন্যায় নকশা (ঝঃধষষবপঃরঃব) ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরণের 'পেনডেনটিভ' 'বাংলা পেনডেনটিভ' নামে পরিচিত।[৮৩] বাংলা পেনডেনটিভ সোনারগাঁয়ের গোয়ালদী মসজিদেও দেখা যায়। *Archaeological Survey Report Munshiganj district* এ গম্বুজটি স্কুইঞ্চ রীতিতে নির্মিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা সঠিক নয়।[৮৪] গম্বুজের বহির্ভাগে ফুটন্ত পদ্মফুল অলংকরণ এবং গম্বুজশীর্ষে ফিনিয়াল যুক্ত করা হয়েছে।

এই মসজিদটি ইট দ্বারা নির্মিত এবং এতে চুন, সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা কয়েকেবার সংস্কারের কারণে টেঙ্গোর শাহী মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হতে চলেছে। মসজিদের নির্মাণশৈলী দেখে

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় পরবর্তীতে বালু সিমেন্ট দ্বারা আস্তর করা হয়েছে। তবে অনুচ্চ প্রবেশ পথ, দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার, স্থূলাকার স্তম্ভ এবং প্রশস্ত দেয়াল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে বুঝতে পারা যায় এটি সুলতানী আমলের শেষের দিকে আফগান শাসন আমলে নির্মিত একটি স্থাপত্য নিদর্শন। ইমারতটি একেবারেই অলংকরণ বিহীন এবং সাদামাটাভাবে নির্মিত।

স্থানীয় জনগণের কাছে থেকে জানা যায় এই মসজিদের প্রবেশ পথের উপর কালো ব্যাসাল্ট পাথরের একটি শিলালিপি ছিল। বর্তমানে শিলালিপিটি দেয়ালে সংযুক্ত অবস্থায় নেই। শিলালিপি পাঠ থেকে জানা যায় মসজিদটি ৯৭৬ হিজরি অনুসারে ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সুলেমান কররাণীর রাজত্বকালে মালিক আব্দুল্লাহ মিঞা নামক জনৈক কাজী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[৮৫] মসজিদ গাত্রের শিলালিপিটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন হরিনাথ দে। ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো:

"God Almighty Says, "The Mosques belongs to God, Worship no one else with him" The Prophet, On whom be peace says, 'He who builds a mosque in the world will have seventy castles built for him by God in paradise, These mosques together with what there is of other buildings" (were built) during the reign of the king age, his august majesty Miyn, during the month of xilquadh 976 (April 1569).[৮৬] এই মসজিদটি কাজীর মসজিদ নামেও পরিচিত। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট থেকে জানা যায় এই মসজিদের নির্মাতা আব্দুল্লহ মিঞা তৎকালীন বিক্রমপুরের কাজী ছিলেন।

স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে মসজিদটি পরিচালিত হয়। কমিটির সদস্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে এই মসজিদের শিলালিপিটি পশ্চিমপাড়া জামে

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় পরবর্তীতে বালু সিমেন্ট দ্বারা আস্তর করা হয়েছে। তবে অনুচ্চ প্রবেশ পথ, দ্বিকেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার, স্থূলাকার স্তম্ভ এবং প্রশস্ত দেয়াল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে বুঝতে পারা যায় এটি সুলতানী আমলের শেষের দিকে আফগান শাসন আমলে নির্মিত একটি স্থাপত্য নিদর্শন। ইমারতটি একেবারেই অলংকরণ বিহীন এবং সাদামাটাভাবে নির্মিত।

স্থানীয় জনগণের কাছে থেকে জানা যায় এই মসজিদের প্রবেশ পথের উপর কালো ব্যাসাল্ট পাথরের একটি শিলালিপি ছিল। বর্তমানে শিলালিপিটি দেয়ালে সংযুক্ত অবস্থায় নেই। শিলালিপি পাঠ থেকে জানা যায় মসজিদটি ৯৭৬ হিজরি অনুসারে ১৫৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সুলেমান কররাণীর রাজত্বকালে মালিক আব্দুলাহ মিঞা নামক জনৈক কাজী কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।[৮৫] মসজিদ গাত্রের শিলালিপিটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন হরিনাথ দে। ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো:

"God Almighty Says, "The Mosques belongs to God, Worship no one else with him" The Prophet, On whom be peace says, 'He who builds a mosque in the world will have seventy castles built for him by God in paradise, These mosques together with what there is of other buildings" (were built) during the reign of the king age, his august majesty Miyn, during the month of xilquadh 976 (April 1569).[৮৬] এই মসজিদটি কাজীর মসজিদ নামেও পরিচিত। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট থেকে জানা যায় এই মসজিদের নির্মাতা আব্দুল্লহ মিঞা তৎকালীন বিক্রমপুরের কাজী ছিলেন।

স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে মসজিদটি পরিচালিত হয়। কমিটির সদস্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে এই মসজিদের শিলালিপিটি পশ্চিমপাড়া জামে

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বেও শিলালিপিটি এই মসজিদের দেয়ালে সংযুক্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে মসজিদটির নির্মাণ কাজ চলতে থাকায় শিলালিপিটি এই মসজিদের সভাপতির নিকট রক্ষিত আছে।

আদিতে এ মসজিদে কোন মিনার ছিল না। মসজিদটিতে পরবর্তীতে একটি দ্বিতল মিনার সংযোজন করা হয়েছে। বাংলায় মসজিদ স্থাপত্যে মিনারের ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। ধারণা করা হয় ঔপনিবেশিক শাসনামলে পরবর্তীতে কিছু কিছু মসজিদে মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের মুয়াজ্জামাপুর মসজিদ, মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের পাথরঘাটা মসজিদে আমরা দ্বিতল মিনার দেখতে পাই। মিনারটি পরবর্তীকালে স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মসজিদটির পূর্বদিকে তিন মিটার চওড়া বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে বারান্দাটি টিন দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদের মুসুল্লিদের অজুর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা। মসজিদটি সরকার কর্তৃক স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়নি এবং স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

খ. মুঘল মসজিদ স্থাপত্য

কোটগাঁ শাহী মসজিদ

(চিত্র : ৯- ১০; ভূমিনকশা : ৩)

শাহী-খান-ই-খোদা মসজিদটি মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কাজীশাইল কোটগাঁ গ্রামে অবস্থিত। ঢাকা মাওয়া সড়কের নিমতলী বাস স্ট্যান্ড থেকে এক কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত।

এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি পরিকল্পনায় বর্গাকার। মসজিদটির আয়তন ৬.১০ মিটার x ৬.১০মিটার।[৮৭] নামাজ গৃহে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটিতে প্রবেশের জন্য পর পর

Dhaka University Institutional Repository

দুটি আয়তাকার ফ্রেম সংবলিত দরজা অতিক্রম করতে হয়। সম্মুখভাগের প্রবেশ পথ হতে অভ্যন্তরভাগের প্রবেশ পথের দুরত্ব ১.৫০ মিটার।[৮৮] মূল প্রবেশ পথটি আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত। আয়তাকার প্যানেলের উপরিভাগ বক্রাকার। আয়তাকার প্যানেলটিতে আবার ছোট ছোট প্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ গুলো অপেক্ষা প্রশস্ততর। পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটিও আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং চতুর্কেন্দ্রিক খিলান সহযোগে গঠিত। উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশ পথ ছিল যা বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অবস্থিত। কেন্দ্রীয় মিহারবটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট দ্বি-খিলান যুক্ত। মিহরাবটি আবার একটি বড় আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। দেয়ালগাত্র সংলগ্ন স্তম্ভ হতে খিলান দুটি উত্থিত হয়েছে। স্ত ম্ভ দুটির নিচের অংশ দেখতে অনেকটা ফুলদানীর মতো। আয়তাকার ফ্রেম প্যারাপেট পর্যন্ত উঠে গেছে। ফ্রেমটির উপরের দিকে এক সারি বদ্ধ মারলন নকশা এবং দুই দিকে দড়ি নকশার বর্ডার পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো অপেক্ষা অধিক অলংকরণ পূর্ণ এবং প্রশস্থ। পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো কম প্রশস্থতর এবং আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। প্রত্যেকটি দেয়ালে দুটি করে মোট আটটি দেয়ালগাত্র সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। আটটি স্তম্ভ হতে কৌনিক খিলান উত্থিত হয়ে উপরের বৃহৎ পেয়ালা আকৃতির গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের অভ্যন্তরে অবস্থান্তর পর্যায়ে ফাঁকা ত্রিকোণ স্থান পূরণে স্কুইঞ্চ রীতি পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। স্কুইঞ্চের মধ্যভাগে মৌচাকের ন্যায় নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। এই মসজিদের গম্বুজের আকৃতি উল্টানো পেয়ালার মতো। এই ধরণের আকৃতি বিশিষ্ট গম্বুজ বাংলা স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[৮৯] উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে দুটি করে চারটি কুলঙ্গি আছে। অভ্যন্তর ভাগের দেয়াল

Dhaka University Institutional Repository

গাত্রে আয়তাকার প্যানেল এবং প্যানেলের মধ্যে খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয় যা মুগল আমলের খিলান নকশার প্রভাব। মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টভুজাকার বুরুজ আছে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকের বুরুজটিতে মোল্ডিং যুক্ত পাঁচটি ব্যান্ড পরিলক্ষিত হয়। এই একটি মাত্র বুরুজ এখনও কিছুটা অক্ষত আছে এবং উপরিভাগ ছত্রী (kiosk) দ্বারা আচ্ছদিত। বাকী তিনটি বুরুজ একেবারেই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বুরুজ গুলো কার্নিশের উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। এই মসজিদের কার্নিশ সুলতানী আমলে নির্মিত মসজিদের বক্রাকার কার্নিশের মতোই বক্রাকার। কিবলা দেয়ালের বহির্ভাগে প্রধান মিহরাব কিছুটা বের হয়ে আছে। মিহরাবের অবতলাকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এরূপ ব্যবস্থা। মসজিদটির ফাসাদে উল্লম্ব এবং আনুভূমিক কয়েকসারি আয়তাকার প্যানেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটির উপরিভাগে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে বহু পত্র যুক্ত খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের বহির্ভাগে কোন আস্তর নেই। সুলতানী আমলের মসজিদের মতোই এই মসজিদটি আস্তর বিহীন এবং পাতলা জাফরী ইট দ্বারা নির্মিত। এই মসজিদের বহির্দেয়ালে বহুখাঁজযুক্ত খিলান নকশা এবং আয়তাকার প্যানেল নকশা পরিলক্ষিত হয়।

এই চমৎকার মসজিদটি কে তৈরী করেছিলেন বা কার আমলে তৈরী হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায় নি। মসজিদটিতে কোন শিলালিপিও পাওয়া যায় নি। খুব সম্ভব এই মসজিদটি সুলতানী আমলের শেষের দিকে এবং মুগল আমলের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছে। তাই এই মসজিদটিতে সুলতানী এবং মুগল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

এই মসজিদটি ইট দ্বারা নির্মিত। মসজিদের বক্রকার কার্নিশ পার্শ্ববুরুজে ব্যান্ডের ব্যবহার, ইউয়ান ধরণের প্রবেশ পথ পেয়ালা আকৃতির গম্বুজ আমাদের সুলতানী স্থাপত্য রীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্কেন্দ্রিক খিলান নির্মাণ, দেয়ালগাত্রে আয়তাকার প্যানেল নকশা ইত্যাদি মুগল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেছে। এই মসজিদটিতে সুলতানী এবং মুগল স্থাপত্য রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়েছে। এই দুই স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠা মসজিদ স্থাপত্য আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদের নির্মাণরীতির সাথে এই মসজিদের নির্মাণরীতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এধরণের স্থাপত্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (বাংলাদেশ সরকার) কর্তৃক নিয়মানুগ ভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত। স্থানীয় জনগণ মসজিদটি কয়েকবার সংস্কার করেছেন। সুলতানী এবং মুগল স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে তৈরী এই মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যথাযথ সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে তার আদি বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে।

পাথরঘাটা মসজিদ

(চিত্রঃ ১১ ; ভূমিনকশাঃ ৪)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার তলবাশাইল ইউনিয়নের পাথরঘাটা গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত। উপজেলা সদর থেকে ৬.৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরে এই গ্রামটির অবস্থান।

এই মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার একটি মসজিদ। অভ্যন্তরীণ অংশের পরিমাপ ৮.৪৫ মিটার x ৪.২৫ মিটার এবং দেয়াল ০.৭৫ মিটার পুরু।[৯০] মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকের দেয়ালে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথ গুলো আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত এবং চতুর্কেন্দ্রিক খিলানাকৃতির যা মুগল আমলের চিরাচরিত একটি বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি ০.৯২ মিটার প্রশস্থ এবং পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটি অপেক্ষা প্রশস্থতর।[৯১] কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথসহ অন্যান্য প্রবেশ পথও আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত। প্রবেশ পথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

অবতলাকৃতির মিহরাব আছে। মিহরাবগুলোও আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষা কিছুটা বড়। মিহরাবটি ত্রিপত্র খিলানযুক্ত এবং অলংকরণহীন। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ০.৯২ মিটার এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো ০.৬২ মিটার প্রশস্থ।[৯২] পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে দরজা ছিল যেগুলো বর্তমানে জানালায় রূপান্তর করা হয়েছে। বাম দিকের মিহরাবটি বর্তমানে কোরআন শরীফ রাখার সেলফ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেয়াল গাত্রে আস্তরের উপর আয়তাকার প্যানেল অলংকরণ দৃষ্টিগোচর হয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বের স্তম্ভগুলো হতে উত্থিত টারেট কার্নিশের উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাহিরে উদগত অংশের দুই পার্শ্বে দুটি সরু টারেট আছে কিন্তু তা কার্নিশের উপর উঠেনি। মসজিদটির কার্নিশ আনুভূমিক ও সমান্তরাল; যা মুগল আমলের একটি উল্লে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রার্থনা গৃহের ছাদ তিনটি কন্দাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটি অপেক্ষা বৃহত্তর। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি একটি উচ্চ অষ্টভুজাকার স্কন্দ বা ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলো উত্তর ও দক্ষিণের প্রশস্থ দেয়াল থেকে উঠে গেছে। মুগল আমলের সবগুলো আয়তাকার ইমারতেই কেন্দ্রীয় নেভ এর উপর নির্মিত গম্বুজ পার্শ্ববর্তী 'বে' এর উপর উপস্থাপিত গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা আকারে ও উচ্চতায় বৃহত্তর।[৯৩] গম্বুজের নিম্নাংশে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা আছে। প্রত্যেকটি গম্বুজেই মুগল রীতি অনুযায়ী কলস ফিনিয়েল লোহার দন্ড দ্বারা সংযুক্ত। গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পেনডিনটিভ রীতি অনুসৃত হয়েছে। আয়তাকার মসজিদটির চারকোণে চারটি অষ্টভুজাকার বুরুজ আছে। বুরুজের নিম্নাংশ ফুলদানীর মতো। বুরুজগুলো কার্নিশের উপরে উঠে গেছে এবং বুরুজগুলো সুদৃশ্য কিউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। মুগল আমলেই আমরা এরকম কিউপোলা

Dhaka University Institutional Repository

আচ্ছাদিত বুরুজ দেখতে পাই। কার্নিশে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়।

কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের পার্শ্বে সাদা মার্বেল পাথরের একটি শিলালিপি আছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় এই মসজিদ মুগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় নির্মিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার করা হয় নি। আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণরীতি বাংলার মুগল স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার ছিলেন নবাব শায়েস্তা খান। তার শাসনামলে বাংলায় বিকশিত স্থাপত্য রীতিকে আহমদ হাসান দানী শায়েস্তাখানী রীতি বলেছেন। তিনি শায়েস্তাখানী রীতির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো- প্যানেল শোভিত ফাসাদ, ফাসাদে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ, কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ হতে প্রশস্ততর, আনুভূমিক এবং সমান্তরাল প্যারাপেট, প্রার্থনাগৃহ তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজ অপেক্ষা বৃহত্তর ইত্যাদি।[৯৪] পাথরঘাটা মসজিদটির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই মসজিদের নির্মাণরীতির সাথে নবাব শায়েস্তা খাঁর সময় নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যরীতির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

মসজিদের দক্ষিণ অংশে দ্বিতল মিনার সংযোজন করা হয়েছে। এধরণের একটি মিনার রিকাবী বাজারের টেঙ্গোরশাহী মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় সুলতানী ও মুগল আমলে নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যে মিনারের ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। সম্ভবত এই ধরণের মিনারের সংযোজন হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনামলে।

মুন্সিগঞ্জের পাথরঘাটা মসজিদটি মুগল মসজিদ স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মসজিদটি মুগল রীতি অনুসরণ করে নির্মিত এবং একেবারেই সাদামাটা এবং অলংকরণবিহীন। মসজিদটিতে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হয়েছে। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মুগল মসজিদের উল্লেখযোগ্য উদহারণ ফিরোজপুরের শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (সপ্তদশ শতক), নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়ম মসজিদ (সপ্তদশ শতক), ঢাকার হাজীখাজা শাহবাজের মসজিদ, মুন্সিগঞ্জের দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদ ও বরিশালের কমলাপুর মসজিদ ইত্যাদি। এই মসজিদের পার্শ্ববর্তী গম্বুজ গুলো অন্যান্য মসজিদের পার্শ্ববর্তী গম্বুজ গুলো অপেক্ষা অনেক বেশী ছোট।

বর্তমানে মসজিদটি স্থানীয় মসজিদ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মসজিদটিতে বর্তমানে দুটি ১৩.৫২ মিটার x ৪.২৬ মিটার বারান্দা সংযুক্ত করা হয়েছে।[৯৫] স্থানীয় জনগণের তত্ত্বাবধানে সংস্কার কার্য পরিচালিত হওয়ার কারণে মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গ. মুগল পরবর্তী মসজিদ স্থাপত্য

বলালী মসজিদ

(চিত্র : ১২ ; ভূমিনকশা : ৫)

বলালী মসজিদটি মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলার আউটশাহী ইউনিয়নের বলালী গ্রামে অবস্থিত। উপজেলার উত্তর দিকে টংগীবাড়ী থেকে বালিগাঁও যাওয়ার পথে রাস্তার উত্তর দিকে চান্দের বাজারের নিকট অবস্থিত। বলালী গ্রামটি আউটশাহী মৌজার মধ্যে পড়েছে।

বলালী মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ছোট মসজিদ। পরিকল্পনায় এই মসজিদটির আয়তন ২মিটার x ২মিটার এবং দেয়াল ০.৭ মিটার পুরু।[৯৬] ইমারতের উত্তর পশ্চিম পূর্ব দিকের অংশ সম্পূর্ণ ভেংগে গেছে এবং পূর্বদিকের ফাসাদ সম্পূর্ণ ভঙ্গুর অবস্থায় বিদ্যমান কার্নিশের বেশীরভাগ অংশ, প্যানেল এবং প্রবেশপথ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। পূর্ব দিকের ফাসাদের কেন্দ্রীয় খিলানযুক্ত প্রবেশ পথটির খিলান পার্শ্ববর্তী বৃত্তাকার স্তম্ভ থেকে উপর

Dhaka University Institutional Repository

দিকে উঠে গেছে। দেয়ালে আস্তরের উপর খিলানযুক্ত প্যানেল অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে একটি করে জানালা থাকলেও বর্তমানে সেগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।[৯৭] পশ্চিম দিকের দেয়ালে একটি মাত্র মিহরাব আছে। কিন্তু পশ্চিম দিকের দেয়ালে মিহরাব বরাবর বহিঃ দেয়ালে কোন বর্ধিত অংশ নেই। প্রার্থনা গৃহের গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পেনডেনটিভ রীতি অনুসৃত হয়েছে।[৯৮] এই মসজিদটি মুগল আমলের শেষের দিকে নির্মিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় । জনসাধারণের কাছ থেকে জানা যায় যে শের আলী শিকদার নামক জনৈক ব্যক্তির পারিবারিক মসজিদ ছিল এবং তার উত্তরাধিকারগণ এখনও এখানে বসবাস করছে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত *Archaeological Survey Report Munshiganj District* অনুযায়ী উক্ত মসজিদ জনৈক গুল মোহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। উক্ত মসজিদে ইমাম সাহেবসহ চারজন নামাজ আদায় করতে পারতেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরণের ছোট ছোট পারিবারিক মসজিদ নির্মাণ রীতি প্রচলিত ছিল। মসজিদটি প্রায় দুইশত বছরের পুরাতন। বর্তমানে এই মসজিদটির আদি অবয়ব ও কোন বৈশিষ্ট্য সঠিক বোঝা যায় না। কারণ এই স্থানটি ঘনজঙ্গলে ঢেকে গেছে। চারপাশ গাছপালা আবৃত হয়ে পড়েছে। জঙ্গল পরিষ্কার না করায় সম্প্রতি এটা যে একটি মসজিদ ছিল তা বুঝার উপায় নেই। একথা বলা যায় যে বর্তমানে মসজিদটি সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে।

আউটশাহী মসজিদ

(চিত্র : ১৩ ; ভূমিনকশা : ৬)

আউটশাহী মসজিদ মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলায় অবস্থিত। উপজেলা ভবন থেকে ১.৬ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে পূর্ব আউটশাহী গ্রামে অবস্থিত। গ্রামের নাম অনুসারে এই মসজিদটির নাম আউটশাহী হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদটি বর্তমানে বসতিহীন এলাকায় এবং পার্শ্ববর্তী চাষের জমি থেকে কিছুটা উচ্চে অবস্থিত।

মসজিদটি একটি একগম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ। ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার এই ইমারতটির আয়তন ৩ মিটার x ৩ মিটার এবং দেয়াল ০.৭০ মিটার পুরু।[৯৯] পূর্বদিকের ফাসাদে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটি অপেক্ষা কিছুটা প্রশস্থতর। প্রবেশ পথটি একটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। প্রবেশ পথটি সমতল কিন্তু প্রবেশ পথের উপরিভাগে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার আলংকারিক খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। খিলানটি প্যানেলের দুই পার্শ্বের দেয়াল সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে। *Archological Survey Report Mushiganj District* প্রতিবেদনে প্রবেশ পথটি সমতল বলা হয়েছে কিন্তু আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত এবং আলংকারিক খিলানের উল্লেখ করা হয়নি। পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথগুলোও আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ এবং সমতল। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপর দুটি সংলগ্ন আলংকারিক স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম দিকের বাহিরের দেয়ালে প্রধান মিহরাবের দুই পার্শ্বে যেরকম টারেট আছে সেরকম পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথগুলোর উপরে টারেট এবং প্যানেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে ফাসাদের দেয়ালের আস্তর প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রার্থনা গৃহের কার্নিশ সমান্তরাল এবং প্যারাপেটে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে ফাসাদের বেশীরভাগ নকশা নষ্ট হয়ে গেলেও কিবলা দেয়ালের প্যারাপেটের বদ্ধ মারলন নকশা সঠিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবেশ পথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অবতলাকৃতির মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষা কিছুটা বৃহত্তর। মিহরাবগুলো স্থানীয় জনগণের দ্বারা সংস্কার করার কারণে এর আদি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রার্থনা গৃহের চারকোণে চারটি গোলাকার পার্শ্বুরুজ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বদিকের বুরুজ দুটো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেলেও পশ্চিম দিকের বুরুজ দুটো এখনও কিছুটা অক্ষত আছে। তার মধ্যে উত্তর পশ্চিম দিকের বুরুজটিতে এখনও ছত্রীযুক্ত কিউপোলা পরিলক্ষিত হয়। বর্গাকার এই মসজিদটি একটি মাত্র গম্বুজ দ্বারা আচ্ছদিত। গম্বুজটি একটি অষ্টভুজাকার ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে। দেয়ালের মধ্যে খিলান নির্মাণ করে পেনডেনটিভ রীতিতে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজের বহির্ভাগে নিচের দিকে দুই সারি বদ্ধ মারলন নকশা দেখা যায়।

মসজিদের বহির্ভাগে সবগুলো দেয়ালেই আয়তাকার প্যানেল এবং আলংকারিক খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়। কিবলা দেয়ালের বহির্ভাগে কেন্দ্রীয় মিহরাবের বর্ধিত অংশের দুইপার্শ্বে দুটি সরু টারেট পরিলক্ষিত হয়। উত্তর দিকের দেয়ালে প্যানেল নকশা এবং দরজা অলংকরণ দৃষ্টিগোচর হয়। মসজিদটি ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদের প্রবেশ পথ ও মিহরাব স্থানীয় জনগণের দ্বারা অনেকবার সংস্কার করা হয়েছে। যার কারণে প্রবেশ পথ এবং মিহরাবের আদিরূপ নষ্ট হয়ে গেছে।

মসজিদটিতে কোন শিলালিপি আবিস্কৃত হয় নি। তাই মসজিদটি কে এবং কবে নির্মাণ করেছেন সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে মসজিদটির নির্মাণ উপাদান এবং নির্মাণশৈলী দেখে ধারণা করা যায় যে এটি মুগল আমলের শেষের দিকে স্থানীয় কোনো শাসক দ্বারা নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। মসজিদটি অনেকখানি মাটির নিচে দেবে গেছে। মসজিদের চারপার্শ্ব জংগলে পরিপূর্ণ তাই মসজিদের অভ্যন্তরে বর্তমানে প্রবেশ করা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই ইমারতটি যত্নের অভাবে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাঁশবাড়ী মসজিদ

(চিত্র : ১৪ ; ভূমিনকশা : ৭)

মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার পূর্ব বাঁশবাড়ী গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি গ্রামের নাম অনুসারে বাঁশবাড়ী মসজিদ নামে পরিচিত। এই মসজিদটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার এই মসজিদটির আয়তন ২.২০ মিটার x ২.২০ মিটার এবং দেয়াল ০.০৫ মিটার পুরু।[১০০]পূর্বদিকের ফাসাদে একটি মাত্র প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথটি স্থানীয় জনগণ বেশ কয়েকবার সংস্কার করেছে। কিবলা দেয়ালে প্রবেশ পথ বরাবর একটি মিহরাব আছে। মিহরাবটিতে বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান নকশা পরিলক্ষিত হলেও প্রবেশ পথের মতই এটা ও পরবর্তী কালে মেরামত করা হয়েছে ফলে এর আদি কোনো বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে না। সমস্ত মসজিদটিতেই অযত্ন এবং অবহেলার ছাপ সুস্পষ্ট। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের দেয়ালে একটি করে জানালা আছে। মসজিদের সম্মুখ ভাগের পার্শ্ব বুরুজগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে মসজিদের সম্মুখভাগে বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে। প্রার্থনা গৃহটি একটি কন্দাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজটি পেনডেনটিভ রীতিতে নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদটি ইট দ্বারা নির্মিত। মসজিদটির অবস্থা দেখলে মনে হয় এটি অত্যন্ত অযত্ন এবং অবহেলার সাথে নির্মিত খুব সাধারণ একটি মসজিদ। মসজিদটি মুগল আমলের শেষের দিকে নির্মিত হয়েছে।

মশুরী পাড়া জামে মসজিদ

(চিত্র : ১৫-১৬ ; ভূমিনকশা : ৮)

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলা হতে ১.৬ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে মশুরীপাড়া গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত। গ্রামের নাম অনুসারেই এই মসজিদটির নাম হয়েছে মশুরীপাড়া মসজিদ। মসজিদটির দাগ নম্বর ৫২৯

Dhaka University Institutional Repository

এবং কুশুরীপাড়ায় অবস্থিত। মসজিদের নিজস্ব একটি পুকুর এবং তিন একর একাশি শতাংশ জমি আছে। মুসুল্লীদের অজু করার জন্য একটি চাপকল আছে।

এই মসজিদটি ভূমি পরিকল্পনায় আয়তাকার। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের আয়তন ৪.৪০ মিটার x ৩.৮৫ মিটার এবং দেয়াল এক মিটার পুরু।[১০১] পূর্ব দিকের ফাসাদে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশপথ গুলো আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের আয়তাকার প্যানেলের দুই পার্শ্বে গোলাকার দুটি সংলগ্ন স্তম্ভ দেখা যায়। স্তম্ভ দুটির নিম্নাংশে খাঁজকাটা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রবেশ পথটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে গঠিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপর আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে একটি শিলালিপি আছে। শিলালিপিটি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটি অপেক্ষা কিছুটা প্রশস্থতর। পশ্চিম দিকের দেয়ালে তিনটি অবতলাকৃতির মিহরাব আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং ফ্রেমের উপরিভাগে একসারি মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মিহরাব দুটিও আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত। এই মিহরাব দুটি অবতলাকৃতির হলেও গভীরতা খুবই সামান্য। উত্তর দিকের মিহরাবটিতে কোরআন শরীফ রাখার জন্য একটি স্টীলের আলমারী রাখা আছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডানদিকে একটি তিন ধাপ বিশিষ্ট মিম্বার আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে প্রবেশ পথ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে আয়তাকার কুলঙ্গি আছে যাতে সম্ভবত পূর্বে মোমবাতি রাখা হত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে একটি ক্ষুদ্র আয়তাকার কাল কষ্টি পাথরের উপর এ মসজিদের দ্বিতীয় শিলালিপিটি উৎকীর্ণ করা আছে; কিন্তু অদ্যাবধি এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টভুজাকার বুরুজ আছে। বুরুজগুলো কার্নিশের উপর উঠে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে যা কিউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং অষ্টভুজাকার বুরুজগুলোর নিম্নাংশ ফুলদানীর মত। মসজিদের প্যারাপেট সমান্তরাল এবং আনুভূমিক। কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাহিরের দিকে উদ্গত অংশ রয়েছে। এই অংশের দুই পার্শ্বে সরু সংলগ্ন মিনারেট আছে। পশ্চিম দিকের বহির্দেয়ালে বিভিন্ন আকৃতির আয়তাকার প্যানেল পরিলক্ষিত হয়।

গম্বুজটি স্কুইঞ্চ রীতিতে নির্মিত হয়েছে। গোলাকার গম্বুজটি একটি অষ্টভুজাকার ড্রামের উপর নির্মিত হয়েছে। ড্রামের ভিতে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজের উপরিভাগ পদ্মফুল ফিনিয়াল যুক্ত। মসজিদটি ইটের সংগে চুন, সুরকি বালিতে সাধারণ ভাবে নির্মিত হয়েছে। মসজিদটির অভ্যন্তর ভাগে চোখ ধাঁধাঁনো কোন অলংকরণ চোখে পড়ে না। অভ্যন্তর ভাগের দেয়ালে আস্তরের উপর প্যানেল এবং খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়। যা মুগল আমলে নির্মিত মসজিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার পরিকল্পনার মসজিদ সুলতানী এবং মুগল উভয় আমলে নির্মিত হলেও নির্মাণ রীতিতে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে এই রীতির প্রথম মসজিদ বিনতবিবির মসজিদ। মুগল আমলের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে এগার সিন্ধুর সাদী মসজিদ (১৬৫২), কিশোরগঞ্জের শাহ মোহাম্মদের মসজিদ, মোহাম্মদপুরের আল্লাকুরী মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে মশুরী পাড়া জামে মসজিদটিতে ৭.৩০মিটার x ৮.৫৫ মিটার[১০২] আয়তনের একটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। কক্ষটির অভ্যন্তরে চারটি বৃত্তাকার স্তম্ভ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি করে মোট চারটি জানালা আছে। কক্ষটি সমতল ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে মসজিদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মশুরী পাড়া জামে মসজিদের প্রবেশ পথের উপর সাদা মার্বেল পাথরের শিলালিপিটি সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি তবে মসজিদের ইমাম সাহেবের সহায়তায় শিলালিপিটির আংশিক পাঠ জানা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হলো:

"লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুল আল্লাহ নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুম কবীর ওয়া বাশশিরিল মুকমিনিনা আল্লাহু খায়রুন হাফিজ।"

দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদ

(চিত্র : ১৭ ; ভূমিনকশা : ৯)

মসজিদটি মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপাল ইউনিয়নের দক্ষিণ কাজীকসবা গ্রামে নির্মিত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ হতে টঙ্গীবাড়ী যাওয়ার পথে হাতের বাম দিকে প্রায় একশ গজ দক্ষিণে মসজিদটি অবস্থিত।

দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদটি আয়তাকার একটি মসজিদ[১০৩]। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের আয়তন ৯ মিটার x ৩.৯০ মিটার। দেয়াল ১.৪০ মিটার পুরু।[১০৪] মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশ পথ আছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথ দুটি অপেক্ষা কিছুটা প্রশস্থতর। উত্তর দিকের প্রবেশ পথ বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশ পথ দুটি বর্তমানে জানালায় রূপান্তর করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ বরাবর কিবলা দেয়ালে একটি অবতলাকৃতির মিহরাব আছে। মিহরাবটির আয়তাকার ফ্রেমে সংস্থাপিত এবং অলংকরণ বিহীন। মসজিদের অভ্যন্তরে আড়াআড়ি খিলান নির্মাণ করে খিলানের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটি অপেক্ষা বড়। মসজিদটির গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে স্কুইঞ্চ রীতি অনুসৃত হয়েছে। গম্বুজের নিম্নাংশে একসারি বদ্ধ মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজের উপর কলস ও চাকা

Dhaka University Institutional Repository

ফিনিয়েল এখনও অক্ষত আছে। মূল প্রার্থনা গৃহের চারকোণের চারটি বুরুজ এখন আর পৃথকভাবে বুঝা যায় না।

বর্তমানে ১০.৬০ মিটার x ৪.৫৫ মিটার আয়তনের বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে।[১০৫] এই মসজিদটি এই গ্রামের কাজী পরিবারের ব্যাক্তিগত সম্পত্তি। মসজিদটি প্রায় সাড়ে চার শত বৎসরের প্রাচীন হলেও পুন:সংস্কারের কারণে মসজিদের আদি অবয়ব নষ্ট হয়ে গেছে।

কাজী পরিবারের ইমাম উদ্দীন কাজী উক্ত মসজিদটি নির্মাণ করেন। তার উত্তরসূরি কাজী বজলুর রহমান বর্তমানে মসজিদ কমিটির সভাপতি। এই পরিবারের সদস্যরাই মসজিদ দেখাশুনা এবং মসজিদের সংস্কার কার্য পরিচালনা করেন।

এই অধ্যায়ে আলোচিত মুন্সিগঞ্জের মসজিদ ও সমাধিগুলোর মধ্যে রামপালে অবস্থিত একমাত্র বাবা আদম মসজিদ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত। অন্যান্য মসজিদগুলো অদ্যাবধি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংরক্ষণের বাইরে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মুন্সিগঞ্জের মন্দির স্থাপত্য

প্রাচীন কাল থেকেই বিক্রমপুর বৌদ্ধ, হিন্দু শাসকদের রাজধানী ছিল এবং সবশেষে এ অঞ্চলে এসেছে মুসলিম শাসকরা। বৌদ্ধ হিন্দু শাসনামলে রাজধানী বিক্রমপুরে অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। কারণ বিক্রমপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য হিন্দু বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। সেই সময়ে অত্র এলাকায় নির্মিত মন্দিরগুলোর গঠন প্রনালী সম্পর্কেও সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নি। বিক্রমপুরে নদীর ঘন ঘন গতিপথ পরিবর্তন, আবহাওয়া, ও জলবায়ুর কারণে এখানের ইমারতসমূহ কালের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। তাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিমদের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলে নির্মিত কোনো স্থাপত্য নিদর্শনের চিহ্ন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। মুসলিমদের আগমনের পর এই অঞ্চলের ধর্মীয়, সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসে। তাই এসময় শুধু বিক্রমপুরেই নয় সারা বাংলায়ই খুব বেশী মন্দির নির্মিত হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর আবার বাংলায় মন্দির নির্মাণ চর্চা শুরু হয়। এই সময়ে নির্মিত মন্দিরের পূজা অর্চনা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। বিক্রমপুরে যেসব মঠ, মন্দির এখনও অক্ষত আছে সেগুলোর বেশীরভাগই মুগল বা মুগল পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছে। মুগল শাসন আমলে হিন্দু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাধু সন্ন্যাসী বা জমিদারদের সমাধির উপর এধরণের মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরে প্রার্থনার মূলে আধ্যাত্মিক শান্তি নিহিত থাকলেও এ বিষয়টি ছিল সমকালীন সভ্যতা ও সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[১০৬] অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নির্মিত মন্দিরগুলো টেরাকোটা অলংকরণ সমৃদ্ধ ছিল।[১০৭] কিন্তু এই সময়ে নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

মন্দিরগুলো পূর্বে নির্মিত মন্দিরগুলোর তুলনায় ছিল অলংকরণহীন। এসময়ে নির্মিত মন্দিরে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মন্দির বিশেষজ্ঞ রতনলাল চক্রবর্তী বাংলার মন্দিরগুলোকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। চালা মন্দির, রত্ন মন্দির এবং শিখর রীতির মন্দির। মুন্সিগঞ্জে যেসব মন্দির পাওয়া গেছে তন্মধ্যে একটি দোচালা মন্দির, একটি আটচালা মন্দির এবং একটি সমতল ছাদযুক্ত মন্দির ব্যতীত শিখর রীতির মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। উঁচু শিখর বিশিষ্ট 'রেখা' ধরণের মন্দির নির্মাণ রীতির প্রচলন প্রচীন আমলেও ছিল। সেন শাসন আমলের কবি উমাপতি ধরের কাব্যে উল্লেখিত মন্দির 'বিন্ধ্য পর্বত থেকে উঁচু' বলে কথিত আছে।[১০৮] সমাধি মন্দির বা মঠ এবং দেবতার অধিষ্ঠান এই দুই ধরণের মন্দিরের প্রচলন রয়েছে মুন্সিগঞ্জে। সংসদ বাংলা অভিধানে মঠের আভিধানিক অর্থ দেওয়া আছে সন্ন্যাসীদের আশ্রম বা আখড়া, মন্দির, টোল, বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি।[১০৯] সাধারণভাবে মঠ বলতে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করার পর সেই স্থানে মৃত ব্যক্তির শশ্মানে নির্মিত ইমারতকে বুঝায়। মুন্সিগঞ্জে নির্মিত মঠের বেশীরভাগই মৃত ব্যাক্তির স্মরণে নির্মিত হয়েছে।

রাধাগোবিন্দ মন্দির

(চিত্র : ১৮ ; ভূমিনকশা : ১০)

রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলার দিঘীরপাড় ইউনিয়নের মুলচর গ্রামে অবস্থিত। আলদী-দিঘীরপাড় রাস্তা হতে প্রায় একশ মিটার পূর্ব দক্ষিণে এই ভগ্নপ্রায় দোচালা মন্দিরটি চোখে পড়ে। পনর, ষোল ও সতর শতকে বাংলায় দোচালা স্থাপত্য ইমারত নির্মাণরীতি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে ধারণা করা যায়। তারই ধারাবাহিকতায় মুন্সিগঞ্জেও দোচালা ইমারত নির্মিত হয়েছিল। মুন্সিগঞ্জে এ পর্যন্ত যতগুলো

Dhaka University Institutional Repository

মন্দির পাওয়া গেছে তন্মধ্যে শিখর রীতিতে নির্মিত মন্দিরের সংখ্যাই প্রাধান্য লাভ করেছে। যে দু'একটি ভিন্নধর্মী মন্দির এখানে নির্মিত হয়েছে তারমধ্যে দোচালা রীতির আলোচ্য রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য।

এই মন্দিরটি ভূমি পরিকল্পনায় আয়তাকার। মন্দিরের বাহিরের অংশের পরিমাপ ৪.১৫মিটার × ৬.৮০ মিটার।[১১০] প্রার্থনা গৃহটি ০.৬০মিটার উঁচু ভিতের উপর অবস্থিত। মন্দিরে প্রবেশের জন্য দক্ষিণদিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথটি একটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ এবং খিলান সহযোগে গঠিত। খিলানটি সম্ভবত সংলগ্ন স্তম্ভ হতে উঠে গেছে। বর্তমানে প্রবেশপথটি এমন ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান যে স্তম্ভগুলো আর চোখে পড়ে না। খিলানটি কোন রীতিতে নির্মিত হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা না গেলেও প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বের দেয়ালে দ্বি-কেন্দ্রিক খিলান সহযোগে নির্মিত বন্ধ দরজা অলংকরণ অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে ; যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটি দ্বি-কেন্দ্রিক খিলান সহযোগে গঠিত। এখানে খিলান নির্মাণে আর্কুয়েট পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। প্রার্থনা কক্ষটির উচ্চতা ৪.৫০ মিটার।[১১১] ফাসাদে চমৎকার বক্রাকার কার্নিশ পরিলক্ষিত হয়। কার্নিশের নিম্নে এবং উপরে একসারি আয়তাকার প্যানেলের ভিতরে পূর্বে বিভিন্ন জীব জন্তুর টেরাকোটা অলংকরণ ছিল বলে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে আয়তাকার খোপ গুলো চোখে পড়লেও অনেক আগেই টেরাকোটা অলংকরণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জানা যায় অবশিষ্ট তিন পার্শ্বের দেয়ালেও বন্ধ দরজার অলংকরণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেয়ালগুলো এতবেশী ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে যে বন্ধ দরজার অলংকরণ খুব অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে। প্রধান ফাসাদের উপরের দিকে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত আয়তাকার প্যানেল এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। পশ্চিম দিকের দেয়ালের গায়ে জন্মানো বটগাছটি শুধু দেয়ালটিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেনি বরং ছাদটিকেও

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। পূর্বদিকের দেয়ালটির উপরেও গাছ জন্মেছে। এই পার্শ্বের দেয়ালটি পশ্চিম দিকের দেয়ালের মতই ক্ষতিগ্রস্ত। মন্দিরের ছাদটি ভেংগে পড়ায় এখন মন্দিরটির অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি পড়ে। গৃহের অভ্যন্তরে বর্তমানে মাটির দেবতার বিগ্রহ রাখা আছে। এখনও মন্দিরে নিয়মিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

মন্দিরটি চালা ছাদ দ্বারা আবৃত। সাধারণত খিলানভিত্তিক ভল্টের উপর দোচালা ছাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এই মন্দিরটি নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই রীতিটি অনুসৃত হয়েছে। মধ্যযুগের শেষভাগে বাংলায় দোচালা ইমারত নির্মাণরীতি জনপ্রিয়তা লাভ করে। পনর, ষোল ও সতর শতকে বাংলার মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যে আঞ্চলিক সভ্যতার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।[১১২] এধরণের ইমারত নির্মাণ রীতির উৎস বাংলার লোক স্থাপত্য[১১৩] গ্রাম বাংলার বাড়ীগুলো বাঁশ খড় দিয়ে তৈরি। খড়ের চাল গুলো বক্রভাবে নির্মাণ করা হয় যাতে বৃষ্টির পানি সাথে সাথেই ঝরে পড়ে। মুন্সিগঞ্জে নির্মিত মন্দির স্থাপত্য গুলোর মধ্যে এ দোচলা মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং খুব সম্ভব ষোড়শ শতকের দিকে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয়। এই মন্দিরে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। কে এবং কবে এ মন্দির নির্মাণ করেছেন সে সম্পর্কেও কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। স্থানীয় পুরোহিত বলেন এখানে রাধাকৃষ্ণের পূজা হত এবং একসময় স্বর্ণের রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রক্ষিত ছিল। কিন্তু হারিয়ে যাওয়ায় এখন মাটির মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং আগের মতোই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। একটি কাঠের দরজা বর্তমানে প্রবেশ পথে সংযোজন করা হয়েছে। এই মন্দিরটি এখন প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন।[১১৪] সংস্কারের অভাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবং মন্দির গাত্রে গাছপালা জন্মানোর জন্য হয়ত মন্দিরটি অচিরেই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ফেগুনসার শিব মন্দির

(চিত্র : ১৯-২০; ভূমিনকশা : ১১)

শিব মন্দিরটি মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মালখানগর ইউনিয়নের ফেগুনসার গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট এই গ্রামটি দুইপানগর নামেও পরিচিত। উপজেলা ভবন থেকে উক্ত গ্রামটি প্রায় ৪.৮ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জে এ পর্যন্ত যেসব মন্দির আমাদের চোখে পড়েছে তন্মধ্যে এই আটচালা শিবমন্দিরটি ভিন্নধর্মী। মন্দিরটি প্রায় তিন শতাংশ জমির উপর নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া মন্দিরের অধিক আর কোন সম্পত্তি নেই। স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা গঠিত কমিটির মাধ্যমে মন্দিরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে মন্দিরটিতে নিয়মিত পূজা পরিচালিত হয়। পূজা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন পুরোহিত অখিলচক্রবর্তী। মন্দিরের এ সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি বলে পরিগণিত।

মন্দিরটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার। অভ্যন্তরীণ ভাগের পরিমাপ ৪.০৬ মিটার × ৪.০৬ মিটার। বাহিরের অংশের পরিমাপ ৫.৬০ মিটার × ৫.৬০ মিটার। প্রার্থনা গৃহটি ০.৪৫ মিটার উঁচু ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে।[১১৫] প্রার্থনা গৃহের দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে একটি করে প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথ দুটি আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত এবং খিলান সহযোগে নির্মিত। বর্তমানে প্রবেশপথ দুটিতে নকশাকৃত গ্রীলের সংযোজন করা হয়েছে। প্রবেশ পথটির পরিমাপ ১.৮২মিটার × .৮১ মিটার।[১১৬] প্রার্থনা কক্ষটি ৪.৪৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট। কক্ষটি একটি সুউচ্চ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণের জন্য বর্গাকার কক্ষটিকে অষ্টভুজে রূপান্তর করা হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণের জন্য পেনডেনটিভ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বাহির থেকে গম্বুজটি দেখতে অনেকটা স্তূপের মতো। এই মন্দিরের কার্নিশটি সমান্তরাল। পূর্ব দিকের কার্নিশটি

Dhaka University Institutional Repository

এখনও অক্ষত আছে। গম্বুজের উপরে ছোট একটি চৌচালা নির্মাণ করা হয়েছে। আয়তাকার কক্ষটির চারপার্শ্বে চারটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ পরিলক্ষিত হয়। প্রবেশপথগুলো আবার আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। প্রার্থনা কক্ষের অভ্যন্তরে গৌরীপট্টের উপর একটি কালো ব্যাসাল্ট পাথরের শিবলিঙ্গ প্রোথিত আছে। কক্ষটির অভ্যন্তরভাগ পলেস্তরা যুক্ত এবং পলেস্তরার উপর বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। দেয়ালের বিভিন্ন অংশের পলেস্তরা খসে পড়ায় মন্দিরটির সৌন্দর্য অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছে। নির্মাণের পর আর কোন সময়ে ইমারতটি সংস্কার করা হয় নি। বর্তমানে ইমারতটির গাত্রে এবং গম্বুজে গাছপালা জন্মানোর কারণে ইমারতটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মন্দিরটি সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। ইমারত গাত্রে কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি। তাই মন্দিরটির নির্মাণকাল এবং নির্মাতার নাম জানা যায় নি। স্থানীয় জনসাধারণের মতে মন্দিরটি সেন রাজা বল্লাল সেনের সময় নির্মিত হয়। কিন্তু ইমারতটির গঠনশৈলী, সমান্তরাল কার্নিশ, সুউচ্চ গম্বুজ, নির্মাণরীতি, মন্দিরটির নির্মাণ উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় ইমারতটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মন্দিরটির সম্মুখভাগে টিনের চাল দ্বারা আবৃত একটি বর্ধিত অংশ পরিলক্ষিত হয়। যারা এই মন্দিরে পূজা দিতে আসে সম্ভবত তাদের জন্য এই অংশটি নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরে ফাগুন মাসের শিবরাত্রে এখনও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আউটশাহী মঠ

(চিত্র : ২১; ভূমিনকশা : ১২)

মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার আউটশাহী ইউনিয়নের আউটশাহী গ্রামে মঠটি নির্মিত হয়েছে। গ্রামের নাম অনুসারে এই মঠটির নাম হয়েছে আউটশাহী মঠ। এই মন্দিরটির নির্মাণরীতি শিখর দেউলের অন্তর্ভুক্ত। মুন্সিগঞ্জে নির্মিত বেশীর ভাগ মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এই রীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

আউটশাহী মঠটি পরিকল্পনায় অষ্টভুজাকার। এই মঠটির এক এক বাহুর দৈর্ঘ্য ২.৫৫ মিটার। বহির্ভাগের দেয়াল ১.১০ মিটার পুরু এবং .৫০ মিটার উঁচু ভিতের উপর স্থাপিত।[১১৭] মন্দিরের প্রথম ধাপটি বা প্রার্থনাগৃহটি ভিত থেকে ৩.৬০ মিটার উঁচু।[১১৮] দক্ষিণ দিকে একটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট চতুর্কেন্দ্রিক খিলানবিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে। খিলানের স্প্যানড্রিলে আস্তরের উপরে ফুলেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে প্রবেশ পথ দিয়ে এই মন্দিরে প্রবেশের কোন উপায় নেই। পার্শ্ববর্তী ভূমি উঁচু হয়ে যাওয়ার কারণে প্রবেশ পথটি রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রার্থনা গৃহের বাকী সাত দিকের বহির্ভাগে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে অলংকৃত প্রবেশপথ নকশা পরিলক্ষিত হয়। অষ্টভুজাকার প্রার্থনা গৃহটির উপর অনুচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করে গম্বুজের উপর ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া শিখরটি নির্মিত হয়েছে। মঠটির সার্বিক উচ্চতা প্রায় ২২.৬০মিটার।[১১৯] শিখর রীতিতে নির্মিত এই মন্দিরটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নির্মাণগত দিক হতে মন্দিরটিকে তিন ধাপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম ধাপে রয়েছে একটি ভিত যার উপর প্রার্থনা গৃহটি নির্মিত হয়েছে। প্রার্থনা গৃহের প্রবেশ পথের দিকটি ব্যতীত বাকী সাতটি দিকে বদ্ধ দরজা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী ধাপটির আটটি পার্শ্বেই আয়তাকার প্যানেল এবং প্যানেলের উপরের অংশটি ধনুকের

Dhaka University Institutional Repository

মত বক্রাকার। প্রত্যেকটি প্যানেলেই আবার ছোট ছোট খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়। এক একটি প্যানেলে পনরটি করে খিলান নকশা দেখা যায়। প্যানেল সংলগ্ন স্তম্ভগুলোতে আস্তরের উপর নকশা পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে হিন্দু মুসলিম স্থাপত্যে ব্যাপকভাবে প্যানেল নকশা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাই এ সময়ে নির্মিত যেকোন স্থাপত্যে প্যানেল নকশা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঠটির দ্বিতীয় ধাপে গোলাকার গম্বুজটি নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পেনডেনটিভ রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। গম্বুজের ভিতে একসারি মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজ থেকে শিখরটি ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। অষ্টকোনাকার শিখরের প্রতিটি পার্শ্বেই ঢেউখেলানো নকশা এবং শিখরের গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়। শিখরের ঢেউখেলানো নকশাকে আ.ক.ম. যাকারিয়া ধনুকবক্রাকৃতির নকশা বলেছেন।[১২০] শিখরটির সর্বশীর্ষে রয়েছে শিকদন্ড। এই মঠটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। মঠটির চারপার্শ্ব জঙ্গল এবং গানের বরজে পরিপূর্ণ। এই মঠটি কখন, কেন এবং কে নির্মাণ করেছিল সেসম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য জানা যায়নি। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এধরণের সুউচ্চ মঠগুলো গায়েবী মঠ নামে পরিচিত। মঠটির নির্মাণরীতি দেখে মনে হয় এটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। এই মঠটির সাথে সোনারগাঁয়ের কালীমন্দির, বরিশালের সুতালরি মঠ এবং মাহিলারা মঠের সাদৃশ্য রয়েছে। মঠটির ভূমি থেকে শিকদন্ড পর্যন্ত সুদীর্ঘ উচ্চতা মঠটিকে দৃষ্টিনন্দন রূপ দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফেগুনসার মঠ

(চিত্র : ২২ ; ভূমিনকশা : ১৩)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার তালতলা খালের পূর্বদিকে ফেগুনসার ইউনিয়নের ফেগুনসার গ্রামে এই সুউচ্চ মন্দিরটি অবস্থিত। গ্রামের নাম অনুসারে এই মঠের নাম হয়েছে ফেগুনসার মঠ। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় এই মন্দিরটি রায় পরিবারের কেউ নির্মাণ করেছিলেন। তাই এই মঠটি রায় মঠ নামেও পরিচিত।

এই মঠটি ভূমি পকিল্পনায় অষ্টভুজাকার। অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ৪.০৫মিটার × ৪.০৫ মিটার এবং বহির্ভাগ সহ এক এক বাহুর পরিমাপ ৪.৯০ মিটার।[১২১] মঠটিতে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং চতুর্কেন্দ্রিক খিলান সহযোগে গঠিত। বাকী সাতদিকে আয়তাকার প্যানেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। এই মঠের অলংকরণের সাথে আউটশাহী মঠের অলংকরণের অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। প্রার্থনা গৃহটি ৫.৬৯ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট।[১২২] প্রার্থনা গৃহটির বাকী সাতপার্শ্বে আস্তরের উপর উল্লম্ব প্যানেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। উল্লম্ব প্যানেলগুলো আবার আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ। এই নকশা কার্নিশ পর্যন্ত উঠে গেছে। কার্নিশের উপরে প্রত্যেক পার্শ্বে অর্ধবৃত্তাকার নকশা পরিলক্ষিত হয়। গর্ভগৃহটির উপর গম্বুজ নির্মাণ করে গম্বুজের উপর অষ্টভুজাকার শিখরটি নির্মাণ করা হয়েছে ; যা ক্রমশ সরু হয়ে উপরের দিকে উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। গম্বুজ থেকে শিখর শীর্ষের উচ্চতা আঠার মিটার।[১২৩] শিখরের শীর্ষে একটি শিক দন্ড ছিল যা বর্তমানে ভেঙে গেছে।[১২৪] শিখরের আটটি পার্শ্বেই আস্তরের উপর ঢেউ খেলানো নকশা এবং অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়। শিখরের উপরের দিকের কয়েকটি সারিতে ঢেউ নকশার পর একসারি ইটের নকশা বর্ধিত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় যা শীর্ষ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত উঠে গেছে। ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত মন্দিরটির সার্বিক উচ্চতা ২৩.১৯ মিটার। ক্রমহ্রাসমান সুউচ্চ মন্দিরটি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। বর্তমানে এই মঠটির নিম্নভাগের অধিকাংশ আস্তর নষ্ট হয়ে গেছে। প্রবেশপথটি ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। মঠটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি। এ ধরণের সুউচ্চ মঠ কেন নির্মাণ করা হয়েছে এ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণ সূত্রে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে মঠের সংজ্ঞা হতে আমরা জানি এ ধরণের মঠ মৃত ব্যক্তির স্মরণে নির্মাণ করা হয়। ফেগুনসার মঠের গঠনশৈলী এবং অলংকরণের সাথে আউটশাহী মঠের সাদৃশ্য রয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে এ দুটি মঠ প্রায় একই সময়ে নির্মিত হয়েছে।

সতীদাহ মঠ

(চিত্র : ২৩ ; ভূমিনকশা : ১৪)

এই মঠটির অবস্থান মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার বেজগাঁও ইউনিয়নের উত্তর বেজগাঁও গ্রামে। লৌহজং উপজেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হতে দুই মাইল উত্তর পূর্বদিকে বেজগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বেই এটি অবস্থিত। ১৯৯৫ সালে লৌহজং উপজেলার অনেকগুলো গ্রাম পদ্মানদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তন্মধ্যে উত্তর বেজগাঁও অন্যতম। গ্রামের অর্ধাংশ নদী গর্ভে চলে যাওয়ায় বর্তমানে মঠটিতে যেতে হলে নদীর তীর দিয়ে যেতে হয়। স্থানীয় জনসাধারণের মতে এই মঠটি সতীদাহ মঠ নামে পরিচিত। লৌহজং উপজেলায় আগে হিন্দু ধর্মের লোকই বেশী বাস করত। হিন্দু ধর্মের প্রথা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সাথে জীবন্ত স্ত্রীকে সহমরণে বাধ্য করা হতো। সহমরণের শেষকৃত্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বেজগাঁয়ে এই মঠটি নির্মিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এই সতীদাহ মঠটি ভূমি পরিকল্পনায় অষ্টভুজাকার। অভ্যন্তরীণ অংশের পরিমাপ ৩.৩৫ মিটার × ৩.৩৫ মিটার। বহির্দেয়ালসহ প্রার্থনা গৃহের পরিমাপ ৪.৬৫ মিটার × ৪.৬৫ মিটার।[১২৫] এক একটি অষ্টভুজাকার বাহুর পরিমাপ ১.৪৫ মিটার এবং গর্ভগৃহটি ০.৩০মিটার উঁচু ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটিতে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশপথ আছে। মন্দির সংলগ্ন রাস্তাটি উঁচু করায় প্রবেশ পথটিকে একটা গুহামুখের মতো মনে হয় এবং ভিতটি এখন আর চোখে পড়ে না। প্রবেশ পথটি একটি আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত এবং খিলান সহযোগে গঠিত। আয়তাকার প্যানেলের দুই পার্শ্বে গোলাকার সরু দুটি সংলগ্ন স্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়। প্রবেশ পথটি এতবেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত যে খিলানটি নির্মাণে কোন রীতি অনুসৃত হয়েছে তা বর্তমানে একেবারেই অস্পষ্ট। অবশিষ্ট সাতটি পার্শ্বে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে আর্কুয়েট পদ্ধতিতে নির্মিত খিলানের বদ্ধ দরজার নকশা পরিলক্ষিত হয়। মঠটির প্রত্যেকটি প্যানেলের উপরিভাগে ঢেউ নকশা বা ধনুক বক্রাতি নকশা এখনও অক্ষুন্ন আছে। গর্ভগৃহটি তিন মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত।[১২৬] অষ্টভুজাকৃতির মন্দিরের ছাদের কার্নিশ মোট আটভাগে বিভক্ত এবং বক্রকার। কার্নিশ থেকে শিখরটি ক্রম হ্রাসমান হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে এবং একটি শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে জানা যায় যে মন্দিরের শীর্ষে এক সময় লোহার দন্ড প্রোথিত ছিল।[১২৭] কিন্তু বর্তমানে মন্দিরটির শীর্ষ হতে কিছু অংশ ভেংগে পড়ায় শিকদন্ডটি আর চোখে পড়ে না। এই মঠের শিখরটি শিরাল রীতিতে নির্মিত হয়েছে। ভিত্তি ভূমি হতে শিখরটির উচ্চতা নয় মিটার।[১২৮] *Archaeological Survey Report Munshiganj District* প্রতিবেদনে শিখরটিকে " The surface of the spire is

Dhaka University Institutional Repository

embellished with a series of upright bands, tapering upwords resembles a pile of bamboo stalk."

মঠটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় কোন সময়ে কে এই মঠটি নির্মাণ করেছে সে বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে মঠটির গঠনশৈলী দেখে অনুমিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ মঠটি নির্মিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুন্সিগঞ্জে যেসব মঠের সন্ধান পাওয়া যায় তন্মধ্যে শিখর রীতিতে গঠিত মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। এটি মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত একমাত্র মঠ যেটির শিখরটি শিরাল রীতিতে নির্মিত হয়েছে।

মন্দিরটি বর্তমানে রাস্তার পার্শ্বে পরিত্যক্ত এবং জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। ইমারতটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয়। শিখর গাত্রে বটগাছ এবং মন্দিরটির চারপার্শ্বে জংগল জন্মেছে যা ইমারতটির ক্ষতিসাধন করছে।

সোনারং মন্দির

(চিত্র : ২৪ ; ভূমিনকশা :১৫)

মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রামে একজোড়া মন্দির রয়েছে। এই মন্দির দুটি শিখর দেউলের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের নাম অনুসারে এ দুটি মন্দির সোনারং মন্দির নামে পরিচিত। গ্রামের নাম কেন সোনারং হলো তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট মতভেদ। পেরিপ্লাস ও টলেমীর বিবরণ হতে জানা যায় যে সে সময়ে বাংলায় স্বাধীন গঙ্গারিডয় রাজ্য ছিল এবং কুমার নদীর মোহনায় গঙ্গেনগরীর অবস্থান ছিল[১২৯]। ধারণা করা হয় এই নগরীর আশেপাশে ছিল সোনার খনি। এই খনি থেকে উত্তোলিত সোনা মিশ্রিত মাটি অন্যস্থানে শোধন করে স্বর্ণ প্রস্তুত করা হত। পরবর্তীতে এসব স্থানের নামের সাথে সোনা নামটি যুক্ত হয়ে গেছে। বাংলায় সপ্তম শতক থেকে সোনাকান্দা, সূবর্ণবীথি, সূবর্ণরেখা নদী, সোনারং ইত্যাদি নামের উৎপত্তি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সোনারং গ্রামের নামটি সম্ভবত এভাবেই এসেছে। প্রাচীনকাল হতেই সোনারং বিক্রমপুর নগরীর একটি অতি সমৃদ্ধ এলাকা ছিল এবং পরবর্তীতেও তা অব্যাহত ছিল। প্রাচীন ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত মুদ্রা, মূর্তি, দেউল পুকুর ইত্যাদির সন্ধান প্রাপ্তি সোনারং এর অতীত সমৃদ্ধি প্রমাণ করে। মুসলিম অধিবাসী বসবাসকারী পাড়ার দেউল বাড়ীর দিঘি হতে প্রাপ্ত গ্রানাইট পাথরের মূর্তিটি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।[১৩০]

সোনারং মন্দির দুটি একই মঞ্চ ভিতের উপর স্থাপন করা হয়েছে। এই জোড় মন্দিরের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ এই মন্দিরটি তিনদিক পুকুর পরিবেষ্টিত এবং পশ্চিম দিকে চলাচলের জন্য একটি পথ রয়েছে। দ্বিতীয়ত ঃ সোনারং মন্দির দুটি একই মঞ্চের উপর নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম দিকের সুউচ্চ মন্দিরটি কালী মন্দির এবং পূর্ব দিকেরটি শিবমন্দির।

১: কালী মন্দির (সোনারং)

কালী মন্দিরটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার। প্রার্থনা কক্ষের পরিমাপ ৫.৩৫ মিটার × ৫.৩৫ মিটার।[১৩১] কক্ষটিতে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম দিকে একটি জানালা আছে। জানালাটি দ্বিকেন্দ্রিক খিলান সহযোগে গঠিত। পশ্চিম এবং উত্তর দিকের কার্নিশের উপর একসারি মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম দিকের বহির্দেয়ালে জানালার উভয় পার্শ্বে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে বন্ধ দরজা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। গর্ভগৃহটিতে মোজাইকের মেঝের উপর পাশাপাশি দুটি বেদী আছে। পূর্বে বেদী দুটিতে বিগ্রহ ছিল বলে অনুমিত হয় কিন্তু বর্তমানে কোন বিগ্রহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা গৃহের সম্মুখভাগে স্তম্ভ ও পিয়ারযুক্ত একটি বারান্দা আছে। বারান্দাতে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ দিকে তিনটি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি করে প্রবেশ পথ আছে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথ দুটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ যা অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে গঠিত। দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথ দুটিও অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে গঠিত। বারান্দাটি সমতল ছাদ দ্বারা আবৃত। প্রার্থনা কক্ষটি একটি অনুচ্চ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণের জন্য বর্গাকার কক্ষটিকে অষ্টভুজে রূপান্তর করা হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অবস্থানান্তর পর্যায়ে স্কুইঞ্চ রীতি অনুসৃত হয়েছে। গম্বুজটি অষ্টভুজাকার শিখরের ভিত হিসেবে কাজ করেছে। প্রার্থনা কক্ষের পরবর্তী ধাপটির বহির্ভাগ বর্গাকার কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে অষ্টভুজ শিখরটি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় ধাপের চারপার্শ্বে পলেস্তরার উপর অর্ধবৃত্তাকার খিলান নকশা দেখা যায়। নকশাকৃত খিলানের ভিতরে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে প্রবেশ পথের নকশা এবং উপরে আরেকটি ছোট আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে ফুলেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। উভয় দিকে প্যানেলের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার বদ্ধ দরজা নকশা দেখা যায়। দরজাগুলো দেয়াল গাত্রের উভয় দিকে সংলগ্ন সরু স্তম্ভ হতে নির্মিত হয়েছে। মন্দিরের সমান্তরাল কার্নিশের চারদিকে চারটি ছোট রত্ন বা শিখর রয়েছে। রত্ন গুলোতে মূল শিখরের মতো ধনুক বক্রাকৃতির নকশা বা ঢেউ নকশা দেখা যায়। শীর্ষভাগে লোহার শীর্ষ দন্ড এখনও অক্ষত রয়েছে। শিখরের তৃতীয় ধাপের আটপার্শ্বেই আন্তরের উপর আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার খিলান যুক্ত বদ্ধ জানালা অলংকরণ দৃষ্টিগোচর হয়। প্যানেলের উপর অষ্টভুজাকার একটি কার্নিশ নির্মিত হয়েছে। কার্নিশের উপরে শিখরের সর্ব শেষ ধাপটি ক্রমশ ক্রমহ্রাসমান হয়ে উপরে উঠে গেছে। শিখরের গাত্রে ধনুক বক্রাকৃতির নকশা পরিলক্ষিত হয় যা শীর্ষে গিয়ে একটি

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। শিখরের শীর্ষভাগে শিকদন্ড দেখা যায়। *Archaeological Survey Report Munshiganj District* অনুযায়ী শীর্ষভাগটিতে কলস ও চক্র ফিনিয়াল সংযুক্ত ছিল।[১৩২] কিন্তু বর্তমানে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। ফিনিয়ালটি উত্তর দিকে সামান্য বেঁকে গেছে। অষ্টভুজাকার শিখরটির প্রত্যেক পার্শ্বে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত আছে। মঞ্চ হতে শীর্ষভাগ পর্যন্ত মন্দিরটির উচ্চতা ১৯.৫০ মিটার[১৩৩] যা মন্দিরটিকে দৃষ্টিনন্দন রূপ দান করেছে।

মন্দিরের দেয়াল গাত্রে প্রোথিত শিলালিপি হতে জানা যায় রূপচন্দ্র নামক একজন অভিজাত ব্যক্তি ১৮৪৩ সালে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে মন্দিরটি পরিত্যক্ত এবং জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। স্থানীয় জনসাধারণের মতে দক্ষিণ দিকের পুকুরটি এই মন্দিরের সমসাময়িক। *Archaeological Survey Report Munshiganj District* এ এই মন্দিরটিকে নবরত্ন মন্দির বলা হয়েছে[১৩৪] কিন্তু তথ্যটি সঠিক নয়। মূল রত্নসহ গর্ভগৃহের চারকোণে আদিতে চারটি ক্ষুদ্রাকৃতির রত্ন এবং বারান্দার উপরে দুই দিকে দুটি রত্ন থাকলেও মূলত মন্দিরটি ক্রমহ্রাসমান শিখর রীতির অন্তর্ভুক্ত।

২: শিব মন্দির (সোনারং)

পূর্ব দিকের মন্দিরটি পশ্চিম দিকের মন্দিরটির তুলনায় উচ্চতার দিক হতে অপেক্ষাকৃত ছোট। ভূমি পরিকল্পনায় প্রার্থনা গৃহটি বর্গাকার। প্রার্থনা কক্ষের পরিমাপ ২.৭০ মিটার × ২.৭০ মিটার।[১৩৫] প্রার্থনা কক্ষের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দুটি প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথের দুই দিকে আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ খিলান নকশা পরিলক্ষিত হয়। প্রার্থনা গৃহের অভ্যন্তরে প্যানেল অলংকরণ এবং প্যানেলের ভিতর ছোট ছোট কুলঙ্গি রয়েছে। প্রার্থনা গৃহটির

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতা ৩.২০ মিটার। প্রার্থনা কক্ষটি একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণের জন্য অবস্থান্তের পর্যায়ে স্কুইঞ্চ রীতি অনুসৃত হয়েছে। গম্বুজটি সুউচ্চ শিখরের অভ্যন্তরীণ ভিত হিসেবে কাজ করেছে।

সুউচ্চ ক্রমহ্রাসমান শিখরটিকে তিনভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রার্থনা গৃহের উপর নির্মিত হয়েছে অষ্টভুজাকার প্রথম ধাপটি। এই ধাপের বহির্ভাগের অংশটি বর্গাকার। এই ধাপের চারপার্শ্বে অর্ধবৃত্তাকার খিলান নকশা দেখা যায়। খিলান নকশার উপর একসারি ফনাতলা সাপের নকশা পরিলক্ষিত হয়। এই অংশের চারকোণে চারটি রত্ন আছে। এই রত্ন গুলোতেও আয়তাকার প্যানেল অর্ধবৃত্তাকার খিলান নকশা, ঘড়িনকশা, ধনুক বক্রাকৃতির নকশার উপরে একসারি করে ফনাতলা সাপের নকশা পরিলক্ষিত হয়। শীর্ষভাগে কলস এবং চক্রযুক্ত ফিনিয়েল দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয় ধাপটি অষ্টভুজাকৃতির এবং প্রত্যেক পার্শ্বে একটি আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে আরেকটি আয়তাকার প্যানেল এবং বন্ধ দরজার অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। প্যানেলগুলো পার্শ্ববর্তী দেয়াল সংলগ্ন স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে। প্যানেলের উপর অষ্টভুজাকার কার্নিশ পরিলক্ষিত হয়। কার্নিশের উপরে তৃতীয় ধাপটি নির্মিত হয়েছে। এই ধাপটিও আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ এবং অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে গঠিত। তৃতীয় ধাপে বন্ধ জানালা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। এই মন্দিরের তৃতীয় ধাপের অলংকরণের সাথে শ্যামসিদ্ধির মঠের প্রার্থনা কক্ষের বহিগাত্রে আস্তরের উপরে কৃত নকশার সাদৃশ্য রয়েছে। এই ধাপটির উপর অবতলাকৃতির ক্রমহ্রাসমান সুউচ্চ শিখরটি নির্মিত হয়েছে। অষ্টভুজাকার শিখরের গাত্রে ঢেউ নকশার উপর একসারি করে ফনাতলা সাপের মুখের নকশা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিখরের এই নকশার সাথে মুন্সিগঞ্জে নির্মিত অন্যান্য শিখর দেউলের পার্থক্য রয়েছে। এই মন্দিরটিতেই আমরা একমাত্র এই ধরণের নকশা দেখি এবং শিখরটির গাত্রে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য শিখরের মতো কোন কবুতর গর্ত নেই। এই ভাবে বক্রাকার নকশা শীর্ষ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। অষ্টভুজাকার শিখরটি শীর্ষে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। চূড়ায় কলস ফিনিয়েল পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে ফিনিয়েলের শীর্ষে চাকা ছিল কিন্তু বর্তমানে তা নেই। মঞ্চ হতে মন্দিরটির সার্বিক উচ্চতা প্রায় ১১ মিটার।[১৩৬] প্রার্থনা গৃহটির চারপার্শ্বে ১.৩০ মিটার প্রশস্ত একটি বারান্দা আছে।[১৩৭] বারান্দাটি পিয়ার ও কলাম সহযোগে গঠিত। বারান্দার প্রতিপার্শ্বে পাঁচটি করে ত্রিখাঁজ খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ রয়েছে। বারান্দাটি ব্যারেল ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। বারান্দার চারপার্শ্বে চারটি মিনিয়েচার রত্ন আছে। উনিশ শতকে বাংলায় যে সব মন্দির নির্মিত হয়েছে তন্মধ্যে সোনারং মন্দিরটি অন্যতম। এই জোড় মন্দিরটিতে একইসাথে আমরা সুলতানী, মুগল এবং ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য অলংকরণের প্রাধান্য এই মন্দির দুটিতে থাকলেও সুলতানী ও মুগল আমলের দ্বিকেন্দ্রিক ও চতুর্কেন্দ্রিক খিলান নির্মাণ রীতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এ মন্দির দুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সুচারুভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমানে মন্দির দুটি পরিত্যক্ত এবং জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। পূর্বে খুব সম্ভব মঞ্চের চারপার্শ্বে চারটি স্তম্ভ ছিল। বর্তমানে দুটি স্তম্ভ টিকে আছে। পূর্বে মন্দির দুটির প্রার্থনা কক্ষের অভ্যন্তরভাগ এবং বারান্দার বহির্ভাগ আস্তর যুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মন্দিরের পলেস্তরা খসে পড়েছে। মন্দিরগুলো নির্মাণের পর এখন পর্যন্ত আর সংস্কার করা হয় নি। সোনারং মন্দির প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয়। এই ধরণের একই মঞ্চের উপর নির্মিত মন্দিরের সংখ্যা বাংলাদেশে খুব বেশী নয়। তাই এই জোড় মন্দির সংরক্ষণ করা প্রয়োজন নাহলে হয়ত কালের গর্ভে এই জোড় মন্দিরটিও একদিন বিলীন হয়ে যাবে। এই মন্দিরটি ১৮৮৬ সালে নির্মিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামসিদ্ধির মঠ

(চিত্র: ২৫; ভূমিনকশা: ১৬)

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার পাটাভোগ ইউনিয়নের শ্যামসিদ্ধি গ্রামে একটি সুউচ্চ মঠ রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট এই মঠটি গ্রামের নাম অনুসারে শ্যামসিদ্ধির মঠ নামে পরিচিত। একসময়ে এখানে মজুমদারদের জমিদারী ছিল। বর্তমানে এই পরিবারের কেউ এখানে বাস করে না। মঠের অধীনে সাত শতাংশ জমি রয়েছে যা দেবোত্তর সম্পত্তির অন্তর্গত। মঠটির গায়ে প্রোথিত শিলালিপি হতে জানা যায় এটি সম্ভুনাথ বাসার্থ মঠ।

এই মঠটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার। অভ্যন্তরীণ অংশের পরিমাপ ৩.৮৫ মিটার × ৩.৮৫ মিটার।[১৩৮] বাহিরের অংশের পরিমাপ ৫.০৫মিটার × ৫.০৫ মিটার।[১৩৯] কক্ষটিতে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ এবং চতুর্কেন্দ্রিক খিলান সহযোগে গঠিত। প্যানেলের উপরে একটি অর্ধবৃত্তাকার অংশ রয়েছে। এই অংশের আস্তরের উপর যে ফুলেল নকশাটি রয়েছে তা দেখতে সূর্যের মতো। খিলানের মধ্যবর্তী অংশে একটি সাদা মার্বেল পাথরের শিলালিপি প্রোথিত আছে। সম্ভবত তা পরবর্তীকালের সংযোজন। এই অংশটির বেশীরভাগ আস্ত রই নষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রবেশ পথটি জায়গায় জায়গায় ভেংগে গেছে। প্রবেশপথ সংলগ্ন স্তম্ভদুটি এতবেশী ভেংগে গেছে যে এখানে যে স্তম্ভ ছিল তার চিহ্ন খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। প্রার্থনাগৃহের মধ্যবর্তী অংশে ছোট একটি শিবলিঙ্গ প্রোথিত আছে এবং এখনও এই মঠটিতে শিব পূজা হয়। উত্তর দিকের দেয়ালে একটি কুলঙ্গি রয়েছে। কুলঙ্গিটি ও চতুর্কেন্দ্রিক খিলানরীতিতে নির্মিত। এখানে পূজার কার্যে ব্যবহৃত সামগ্রী রাখা হয়। প্রার্থনা কক্ষটি ৫.১০ মি: উচ্চতাবিশিষ্ট। কক্ষটি একটি গম্বুজ দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ রীতি অনুসৃত হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণের জন্য বহু খাঁজ বিশিষ্ট খিলান নির্মাণ করা হয়েছে । প্রবেশদ্বারের খিলানের মতো এখানেও সূর্যের প্রতীক ফুলেল নকশা এবং স্প্যানড্রিলে তিনটি করে ফুলেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজের ভিত্তিতে দুই সারি ফুলেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। সারা দেয়াল আয়তাকার প্যানেলে বিন্যাসিত ও পলেস্তরাযুক্ত। তবে বেশীর ভাগ অংশের পলেস্তরা নষ্ট হয়ে গেছে। এই সুউচ্চ মঠটি চার ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছে প্লিন্থ দ্বিতীয় ভাগে প্রার্থনা গৃহ। প্রার্থনা গৃহের প্রবেশ পথ সহ প্রত্যেক পার্শ্বের বহির্ভাগের আয়তাকার প্যানেল দুটি অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে গঠিত। একটির মধ্যে আরেকটি খিলান নির্মাণ করা হয়েছে। খিলান দুটি পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে উত্থিত হয়েছে। সম্পূর্ণ দেয়ালই একসময় আস্তরযুক্ত ছিল। বর্তমানে খুব অল্প অংশেই পলেস্তরা অবশিষ্ট আছে। প্রার্থনা কক্ষের গম্বুজের উপর অষ্টভুজাকার তৃতীয় ধাপ নির্মাণ করা হয়েছে। এই অংশের উচ্চতা ৪.৫০ মিটার এবং আট দিকেই উল্লম্ব আয়তাকার প্যানেল আছে। প্যানেলগুলো সংলগ্ন সরু স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে। এক একটি প্যানেল আবার দুটি অংশে বিভক্ত। নিম্নের আয়তাকার প্যানেলে বদ্ধ জানালা নকশা এবং উপরে অর্ধবৃত্তাকার অংশ রয়েছে। একটি মাত্র অর্ধবৃত্তাকার অংশের আস্তরে সাতটি সাপের মুখ একত্রে পরিলক্ষিত হয় এবং ভিতরের দিকে একটি ছিদ্র আছে। বাকী সাত পার্শ্বে ফুলেল নকশা দেখা যায়। পরবর্তী আয়তাকার প্যানেলের উপরে এক সারি মোল্ডিং নকশা পরিলক্ষিত হয়। এরপরের অংশটি ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠে একটি শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। ক্রমহ্রাসমান সুউচ্চ শিখরটির গাত্রে অসংখ্য কবুতর গর্ত রয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রচুর টিয়া বাস করে। ভূমি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত মঠটির সার্বিক উচ্চতা ১৯.৫০ মিটার।[১৪০]এই মঠটি সম্পূর্ণরূপে লাল ইট দ্বারা নির্মিত এবং লাল আস্তরযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যা দেখতে অত্যন্ত মনোরম । প্রবেশ পথের উপর একটি সাদা মার্বেল পাথরের শিলালিপি প্রোথিত আছে। শিলালিপি হতে জানা যায় শম্ভুনাথ মজুমদার কর্তৃক ১২৪৩ বাংলা ১৮৩৬ ইংরেজী সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভীমমন্ডল নামক জনৈক পুরোহিত মঠের পূজা পরিচালনা করেন। এই মঠে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের দুই তারিখে মেলা হয়। মেলায় দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর লোক আসে। মুন্সিগঞ্জে এখনও যেসব ঐতিহ্যবাহী মেলা অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা অন্যতম। বর্তমানে মঠটির গায়ে বটের চারা জন্মেছে এবং দেয়াল গাত্রের পলেস্তরা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই অঞ্চলে নির্মিত মঠ গুলোর মধ্যে এই মঠটি সুউচ্চ, দৃষ্টিনন্দন ও হৃদয় আগ্রাহী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। মঠটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয়।

কালী মন্দির (মধ্যপাড়া)

(চিত্রঃ ২৬; ভূমিনকশাঃ ১৭)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের উত্তর মধ্যপাড়া গ্রামে এই কালী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। ইছাপুরা স্কুল থেকে মন্দিরটি ১.৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানে মন্দিরটির আশেপাশে চাষের জমি এবং উত্তরদিকে একটি পায়ে চলা পথ পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। মন্দিরের জমিটুকু খাস জমির অন্তর্ভুক্ত। কালী মন্দিরটি ভূমি পরিকল্পনায় আয়তাকার। মন্দিরটির পরিমাপ ৬.১০মিটার × ৪.৪০ মিটার এবং প্রার্থনা কক্ষটি ০.৮০মিটার উঁচু ভিতের উপর অবস্থিত।[১৪১] মন্দিরটি দুটি অংশে বিভক্ত। একটি প্রার্থনা গৃহ আরেকটি বারান্দা উভয় অংশই উঁচু ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটিতে প্রবেশের জন্য দুটি প্রবেশ পথ আছে। একটি দক্ষিণ দিকে এবং একটি পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে দুটি কুলঙ্গি রয়েছে। পূর্ব দিকের

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ালে একটি কুলঙ্গি আকৃতির জানালা এবং দুটি কুলঙ্গি আছে। উত্তর দিকের দেয়ালে একটি গভীর কুলঙ্গি রয়েছে। সম্ভবত এখানে বিগ্রহ রাখা হতো। কুলঙ্গিগুলো আয়তাকার ফ্রেমে সংস্থাপিত। অভ্যন্তরভাগের আস্তর নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরের দেয়াল গাত্রে জন্মানো বটগাছ ইমারতটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে এবং পুরো ইমারতটিকে ঢেকে ফেলেছে। বারান্দাটিতে তিন খাঁজ বিশিষ্ট খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ ছিল বলে জানা যায়।[১৪২] অনেক আগেই প্রবেশ পথ গুলো ভেংগে পড়েছে। শুধু স্তম্ভ দুটির চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে কুলঙ্গি রয়েছে। মন্দিরটির বিভিন্ন দেয়াল জায়গায় জায়গায় ভেংগে পড়েছে। মন্দিরটি খুব সম্ভব সমতল ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল। ভগ্নপ্রায় মন্দির থেকে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। এই মন্দিরটির সঠিক নির্মাণ তারিখ জানা যায়নি। মন্দিরটির গঠনশৈলী দেখে অনুমিত হয় ইমারতটি উনবিংশ শতাব্দিতে নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মন্দিরটি বটগাছ দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে যে যেকোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মুন্সিগঞ্জে নির্মিত অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে এই মন্দিরটিতেই একমাত্র বারান্দা রয়েছে।

কালীর আটপাড়া মন্দির

(চিত্রঃ ২৭; ভূমিনকশাঃ ১৮)

মুন্সিগঞ্জ জেলার বজ্রযোগিনী ইউনিয়ন পরিষদের কালীর আটপাড়া গ্রামে এই শিব মন্দিরটি অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জ হতে টঙ্গীবাড়ী যাওয়ার পথে রাস্তার পার্শ্বে পর পর তিনটি মন্দির চোখে পড়ে তন্মধ্যে এই শিবমন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মন্দিরটি পঞ্চরত্ন মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত। বাকী মন্দির দুটি পরে নির্মিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিবমন্দিরটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার। প্রার্থনা কক্ষের পরিমাপ ২.৮৫ মিটার × ২.৮৫ মিটার এবং ০.৩৫ মিটার ভিতের উপর কক্ষটি নির্মাণ হয়েছে।[১৪৩] দক্ষিণ দিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথটি একটি আয়তাকার প্যানেলে আবদ্ধ এবং প্যানেলের দুই পার্শ্বে সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। ফাসাদের উভয় পার্শ্বের দেয়াল প্রায় ভেংগে গেছে। প্রার্থনা গৃহটির উচ্চতা ২.৮৫ মিটার এবং কার্নিশটি বক্রাকার।[১৪৪] পূর্বে মন্দিরটি আস্তরযুক্ত ছিল। বর্তমানে বেশীরভাগ অংশের আস্তর খসে পড়েছে। মুগল আমলে সব ধরণের স্থাপত্যে ইটের ব্যবহারের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। এসময় টেরাকোটা অলংকরণের পরিবর্তে আস্তরের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই মন্দিরটির শুধুমাত্র দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্বের অলংকারিক রত্নটি এখনও বিদ্যমান থাকলেও রত্নের শীর্ষভাগ ভেংগে গেছে। প্রতিটি রত্নই চৌচালা রীতিতে নির্মিত হয়েছে। চারপার্শ্বেই খিলান যুক্ত উন্মুক্ত স্থান আছে এবং চারপার্শ্বের কার্নিশই বক্রাকার। বর্তমানে মন্দিরের কার্নিশের উপর অনেক গাছপালা জন্মেছে। যা মূল রত্নটিকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের রত্নসহ ইমারতটির দেয়ালের বেশীর ভাগ অংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রার্থনা গৃহটি একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজের উপর মূল রত্নটি নির্মিত হয়েছে। এই রত্নটি চৌচালা ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। রত্নটির দক্ষিণ দিকে একটি খিলান যুক্ত উন্মুক্ত স্থান রয়েছে। বাকী পার্শ্ব গুলোতে দরজা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রধান রত্নটির শীর্ষভাগে পূর্বে একটি লোহার শিকদন্ড প্রোথিত ছিল।[১৪৫] বর্তমানে শীর্ষভাগের কিছুটা অংশ ভেংগে পড়েছে। এই মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। পূর্বে এখানে পূজা অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী নতুন ইমারতটিতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবমন্দিরটি ভেংগে যাওয়ায় পার্শ্ববর্তী ইমারতটি নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ইমারত গাত্রে এবং কার্নিশের উপর গাছপালা জন্মানোর কারণে

Dhaka University Institutional Repository

ইমারতটি প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন। ইমারত গাত্রে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ইমারতটির নির্মাণগত বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইমারতটি নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের উপর চারকেণে চারটি সরু টারেট নির্মাণ করে আয়তাকার অংশটি নির্মাণ করা হয়েছে। পরে আয়তাকার অংশটির উপর চৌচালাটি নির্মিত হয়েছে। রত্নের দেয়ালগুলোতে আয়তাকার প্যানেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে শিকদন্ড ছিল সেখানে বর্তমানে গাছপালা জন্মেছে।

হাঁসাড়া মঠ

(চিত্র: ২৮; ভূমিনকশা: ১৯)

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া গ্রামে এই সুউচ্চ মঠটি অবস্থিত। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে গ্রামের নাম অনুসারে এই মঠটি হাঁসাড়া মঠ নামেই পরিচিত। ঢাকা-মাওয়া সড়কের ০.৪ কিলোমিটার পশ্চিমে এই মঠটির অবস্থান।

হাঁসাড়া মঠটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার। অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ২মিটার × ২মিটার এবং বাহিরের অংশের পরিমাপ ২.৫০মিটার × ২.৫০ মিটার।[১৪৬] প্রার্থনা কক্ষটি ০.৫০ মিটার উঁচু ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে।[১৪৭] দক্ষিণ দিকে অর্ধবৃত্তাকার খিলান সহযোগে গঠিত প্রবেশ পথ এবং পশ্চিমদিকে কুলঙ্গি আকৃতির একটি জানালা আছে। উত্তরদিকের দেয়াল সংলগ্ন একটি বেদী পরিলক্ষিত হয় স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হতে জানা যায় পূর্বে এই বেদীটিতে একটি শিবলিঙ্গ প্রোথিত ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় এই মঠে এক সময় শিব পূজা হতো। বর্তমানে মঠটি পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান। গর্ভগৃহটির উচ্চতা ৩.৭৫ মিটার।[১৪৮] গৃহটি একটি অনুচ্চ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ নির্মাণে পেনডেনটিভ রীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রার্থনা

Dhaka University Institutional Repository

কক্ষটির অভ্যন্তরভাগ এবং বহির্ভাগ পূর্বে আস্তরযুক্ত ছিল। বর্তমানে জায়গায় জায়গায় আস্তর খসে পড়েছে। উত্তর ও পশ্চিম দিকের দেয়ালের বহির্ভাগে আয়তাকার প্যানেলের অভ্যন্তরে খিলান যুক্ত বন্ধ দরজা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। আয়তাকার প্যানেলের উপরিভাগে মোল্ডিং নকশা এবং তার উপরে একসারি মারলন নকশার মত নকশা দেখা যায়। পলেস্তরা খসে পড়ায় সম্পূর্ণ কক্ষটির সামান্য অংশেই আস্তরের উপর এধরণের নকশা বর্তমানে বিদ্যমান আছে। প্রার্থনা কক্ষের উপর নির্মিত পিরামিড আকৃতির ক্রমহ্রাসমান শিখরটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অষ্টভুজাকৃতি অংশের প্রত্যেকটি পার্শ্বেই আয়তাকার প্যানেল এবং প্যানেলের দুই পার্শ্বে সংলগ্ন স্তম্ভ আছে। প্যানেলের অভ্যন্তর ভাগে খিলানযুক্ত বন্ধ জানালা অলংকরণ এবং খিলানের স্প্যানড্রিলে ফুলেল নকশা এখনও দেখা যায়। এই প্যানেলের উপরে আবার একটি ছোট আয়তাকার প্যানেল এবং তার উপরে অর্ধবৃত্তাকার নকশা ও অর্ধবৃত্তের উপরিভাগে কয়েকসারি মোল্ডিং নকশা পরিলক্ষিত হয়। মোল্ডিং নকশার উপরিভাগে মারলন নকশার মতো একসারি নকশা দেখা যায়। এই অষ্টাভুজাকার শিখরটি উপরের দিকে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে শীর্ষে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। শিখরের প্রত্যেক পার্শ্বে সমান দুরত্বে দশটি করে কবুতর গর্ত দৃষ্টিগোচর হয়। শীর্ষভাগে আমলকী কলসী ও পট ফিনিয়েল এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। প্রার্থনা কক্ষের প্রবেশ পথের উপর একটি সাদা মার্বেল পাথরের শিলালিপি পরিলক্ষিত হয়। তাতে লেখা আছে শ্রী রামকুমার পাল চৌধুরী মহাশয়ের মঠ। শ্রীমতি মনোমহিনী চৌধুরানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১২৮৯ বাংলা ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। অর্থাৎ এই মঠটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের চৌধুরী বাজার মঠের মতো এই মঠটির চারকোণে চারটি রত্ন ছিল কিন্তু চারটি রত্নই পরে গেছে। বর্তমানে এই স্থানটিতে দুই

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি মুসলিম পরিবার বাস করে। তারা ক্রয়সূত্রে এ জমির মালিক। মঠের প্রার্থনা গৃহটি কাঠ, পাটখড়ি ইত্যাদি জ্বালানী রাখার কাজে ব্যবহার করছে।

চৌধুরী বাজার মঠ

(চিত্র: ২৯; ভূমিনকশা; ২০)

মুন্সিগঞ্জ জেলার মহাখালী ইউনিয়নের চৌধুরীবাজার গ্রামে এই মঠটি অবস্থিত। এখানে একসময় যে জমিদাররা বাস করতেন তারা চৌধুরী নামে পরিচিত ছিল। এই জমিদার পরিবারেরই কেউ এই মঠটি নির্মাণ করেছিলেন। তাদের নাম অনুসারে এই জায়গার নামকরণ করা হয়েছে। অনেক আগেই তাদের উত্তরাধিকারীরা এ জায়গা বিক্রি করে ভারত চলে গেছে। মুন্সিগঞ্জ সদর হতে ৪.৮ কিলোমিটার দাক্ষণ পশ্চিমে মঠটি অবস্থিত।

মঠটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার। অভ্যন্তরীণ ভাগের পরিমাপ ২.৮৫ মিটার × ২.৮৫ মিটার।[১৪৯] প্রার্থনা গৃহটির দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে একটি করে প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথ দুটি আয়তাকার প্যানেলে সংস্থাপিত। পশ্চিম দিকে একটি জানালা আছে। জানালাটি ০.৫০ মিটার প্রশস্থ এবং উচ্চতা ১.৬০ মিটার।[১৫০] উত্তর দিকে একটি কুলঙ্গি রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে জানা যায় পূর্বে এই মঠটিতে পূজা অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানে মঠটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত। প্রার্থনাগৃহটি ৪.১৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট।[১৫১] প্রার্থনা কক্ষের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণের জন্য বর্গাকার কক্ষটিকে অষ্টভুজে রূপান্তর করা হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অবস্থানান্তর পর্যায়ে পেনডেনটিভ রীতি অনুসৃত হয়েছে। গম্বুজের উপর অষ্টাভুজাকার ক্রমশ হ্রস্বায়মান সুউচ্চ শিখরটি নির্মিত হয়েছে। প্রার্থনা কক্ষের বহির্ভাগ পূর্বে পলেস্তরা যুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমানে বেশীরভাগ অংশের পলেস্তরা খসে পড়েছে। প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে আয়তাকার বদ্ধ দরজা

Dhaka University Institutional Repository

নকশা ও লিনটেলের উপর প্যানেলের ভিতর অর্ধবৃত্তাকার নকশা পরিলক্ষিত হয়। চারপার্শ্বে একই ধরণের নকশা রয়েছে। প্রার্থনাগৃহের কার্নিশ সমান্ত রাল। কার্নিশের উপর চারকোণে চারটি রত্ন নির্মিত হয়েছে। পশ্চিম দিকের রত্নটির অর্ধেকের বেশী ভেংগে গেছে। পূর্বদিকের একটি রত্নের শীর্ষ ভাগ ভেংগে গেছে। রত্নগুলো চৌচালা রীতিতে নির্মিত এবং প্রত্যেকটি রত্নের চারপার্শ্বেই খিলানযুক্ত উন্মুক্ত অংশ রয়েছে। বাকী দুটি রত্নের চৌচালা এখনও অক্ষত আছে। গম্বুজের উপর নির্মিত শিখরটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের প্রতিটি পার্শ্বে একটি করে আয়তাকার প্যানেল আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার দরজা অলংকরণ এবং দরজার লিনটেলের উপর অর্ধবৃত্তাকার নকশা পরিলক্ষিত হয়। দেয়ালে গাত্রে কবুতর গর্ত দেখা যায়। দুটি প্যানেলের মধ্যবর্তী পিলাষ্টার রয়েছে। পিলাষ্টার গাত্রেও কবুতর গর্ত দেখা যায়। পরবর্তী অংশটিতে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে খিলান সহযোগে গঠিত দরজা অলংকরণ এবং দেয়াল গাত্রে কবুতর গর্ত রয়েছে। আয়তাকার প্যানেলের উপরিভাগে অর্ধবৃত্তাকার কার্নিশ নির্মিত হয়েছে। কার্নিশের উপর ক্রমহ্রাসমান শিখরটি উঠে গেছে। শিখরের তৃতীয় অংশটিতে নির্দিষ্ট দুরত্বে করা অর্ধবৃত্তাকার নকশা ক্রমশ শীর্ষে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। শিখরের গাত্রে অসংখ্য কবুতর গর্ত পরিলক্ষিত হয়। শীর্ষভাগে কলসী ও আমলকী ফিনিয়েল এখনও অক্ষত রয়েছে। কিছুদিন আগে ঝড়ে ফিনিয়েলটি সম্পূর্ণরূপে বেঁকে গেছে। ভূমি থেকে সার্বিক ইমারতটির উচ্চতা ১৮.১৫মিটার।[১৫২]

Archaeological Survey Report Munshiganj District -এ এই মঠটির উত্তর ও পশ্চিম দিকে দুটি জানালা রয়েছে বলে উল্লেখিত আছে।[১৫৩] প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমে একটি জানালা আছে এবং উত্তর দিকে একটি ছোট কুলঙ্গি রয়েছে।[১৫৪] বর্তমানে ইমারতটি পরিত্যক্ত এবং অবহেলিত

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থায় বিদ্যমান। মঠটির পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ এবং পূর্ব দিকে একটি সরু পায়ে চলা পথ আছে। মঠটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি। স্থানীয় জনসাধারণ সূত্রে জানা যায় কেদার রায় চৌধুরী এখানের জমিদার ছিলেন। তার কোন উত্তরাধীকারীর দ্বারাই এই মঠটি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এ জায়গাটির মালিক একজন মুসলমান ব্যক্তি হলেও মঠটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মঠটি ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত মঠটি ভেংগে ফেলা হবে না। ধর্মীয় ইমারত হিসেবে মঠটির মর্যাদা রয়েছে।

401829

সরকার মঠ

(চিত্র: ৩০; ভূমিনক্শা; ২১)

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত তাজপুর গ্রামে সরু পায়ে চলা রাস্তার পাশে একসারিতে তিনটি মঠ দৃষ্টিগোচর হয়। এই মঠগুলো সরকার মঠ নামে পরিচিত। সিরাজদিখান উপজেলা ভবন হতে প্রায় দুইশত মিটার পশ্চিম দক্ষিণে সরকার পুকুরের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানের তিনটি মঠের মধ্যে সর্বোচ্চ উঁচু মঠটিই ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী মঠের গায়ে বন্দেমাতরম লেখা রয়েছে। খুব সম্ভবত এই মঠটি স্বদেশী আন্দোলনে নিহত কোনো শহীদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে।

একসময় মুন্সিগঞ্জের বেশীরভাগ এলাকাই হিন্দু জমিদারদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। তাই আমরা এই অঞ্চলটিতে অনেক মঠ দেখতে পাই। কিন্তু বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হওয়ায় বেশীর ভাগ মঠের আশেপাশে মুসলিম বসতিই চোখে পড়ে। এই এলাকাটি একসময় সরকারদের অধীন ছিল। যাদের একজন বংশধরের নাম আশুতোষ সরকার। কিন্তু বর্তমানে তাদের কেউ আর এখানে বসবাস করে না। সরকারের কাছ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পারুল বেগম নাম্নী এক মহিলা নিরানব্বই বৎসরের জন্য এই জমিটি লীজ নিয়ে এখানে বসবাস করছে।

তিনটি মঠের মধ্যে দক্ষিণ দিকের মঠটি সর্বাপেক্ষা উঁচু। এই মঠটি ভূমি পরিকল্পনায় বর্গাকার অভ্যন্তরীণ ভাগের পরিমাপ ১.৪৫মিটার × ১.৪৫ মিটার এবং বহির্ভাগের পরিমাপ ২.৯৫ মিটার × ২.৯৫ মিটার।[১৫৫] প্রার্থনা কক্ষটির দক্ষিণ দিকে একটি বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। বাকী তিন দিকে বন্ধ দরজা অলংকরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রার্থনা গৃহটি ৩.৫৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট।[১৫৬] কক্ষের বহির্ভাগের চারদিকে চারটি বক্রাকার কার্নিশ নির্মাণ করা হয়েছে। দক্ষিণ দিকের কার্নিশটি বর্তমানে কিছুটা ভেংগে গেছে। চারপাশে চারটি রত্ন নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে চারটি রত্নই প্রায় অর্ধেকের বেশী ভেংগে গেছে। কক্ষটি একটি অনুচ্চ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছদিত। গম্বুজটি পেনডেনটিভ রীতিতে নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজের উপর অষ্টভুজাকার ক্রমহ্রাসমান শিখরটি নির্মিত হয়েছে। সুউচ্চ শিখরটি আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। গম্বুজের উপর নির্মিত অষ্টভুজের প্রথম ধাপটি আন্তর যুক্ত। আটপার্শ্বে আটটি প্যানেল এবং প্যানেলের মধ্যে বন্ধ দরজা অলংকরণ ও প্যানেল সংলগ্ন স্তম্ভ রয়েছে। এই ধাপের উপরিভাগে অষ্টভুজাকার একটি কার্নিশ নির্মিত হয়েছে। কার্নিশের উপর শিখরটির দ্বিতীয় ধাপ নির্মিত হয়েছে। এই অংশটি পূর্বের অংশের মতোই আন্তরযুক্ত এবং আয়তাকার প্যানেল নকশা ও প্যানেলে বন্ধ দরজা নকশা পরিলক্ষিত হয়। এই অলংকরণের উপরের অংশটিতে মোল্ডিং নকশার মতো একসারি নকশা দেখা যায়। পরবর্তী অষ্টভুজাকার ধাপটি আন্তরযুক্ত কিন্তু অলংকরণ বিহীন। ক্রমশ হ্রাসমান হয়ে উপরে উঠে একটি শীর্ষ বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। শিখরের গায়ে অন্যান্য মঠের মতোই অনেক কবুতর গর্ত দেখা যায়। শীর্ষে কলস ফিনিয়েল পরিলক্ষিত হয়। ভিত্তি ভূমি হতে মঠটির সার্বিক উচ্চতা প্রায় ১৮.০৫

Dhaka University Institutional Repository

মিটার।[১৫৭] প্রবেশপথের উপরে খিলানের স্প্যানড্রিলে সংস্কৃত ভাষায় হয়তো নির্মাতার নাম লিখিত আছে কিন্তু পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। মন্দিরটি ১৮৯৮ সালে বাংলা ১৩০৫ এ নির্মিত হয়েছে।

বর্তমানে মঠটি পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান। নির্মাণের পর এই মঠটি আর সংস্কার করা হয় নি। ফলে সংস্কারের অভাবে মঠটির প্রবেশদ্বারের কিছু অংশ ভেংগে গেছে।

মাইজপাড়া মঠ

(চিত্রঃ ৩১; ভূমিনকশা; ২২)

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখাল ইউনিয়নের মাইজপাড়া গ্রামে একটি সুউচ্চ মঠ নির্মিত রয়েছে যা মাইজপাড়া মঠ নামে পরিচিত। এক সময় এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন বৈদ্যনাথ রায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাকে এখানে পোড়ানো হয়েছিল। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে পুত্র তারাপদ রায় এই সুউচ্চ মঠটি নির্মাণ করেছিল। এই মঠটির দুই পার্শ্বে দুটি ছোট চৌচালা মঠ আছে। জমিদারের পৌত্রবধু অঞ্জলী রায়ের কাছ থেকে জানা যায় এই ছোট মঠ দুটি জমিদারের দুই স্ত্রীর। এই মঠটি সম্পর্কে কোনো তথ্য ইতোপূর্বে কোথাও পাওয়া যায় নি। মঠটি অনেক প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও *Archaeological Survey Report Munshiganj District* এ এই মঠটি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি। এই মঠটি ভূমি পকিল্পনায় অষ্টভুজাকার। মঠের বহির্ভাগের একএক বাহুর পরিমাপ ২.০৩ মিটার এবং অভ্যন্তর ভাগের এক এক বাহুর পরিমাপ ১.০৫ মিটার ও দেয়াল .৯৫ মিটার পুরু। মঠটি .৯৫ মিটার উঁচু ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে।[১৫৮] গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ দিকে চতুর্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে যার আয়তন ১.৯০ মিটার দ্ধ .৯০ মিটার। উত্তর দিকের

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ালে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে একটি ০.৭৫ মিটার × ১.২০ মিটার আয়তনের একটি কুলঙ্গি আছে।[১৫৯] সম্ভবত পূজায় ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এখানে রাখা হতো। এছাড়া প্রত্যেক দেয়ালে একটি করে দ্বিকেন্দ্রিক খিলানযুক্ত ছোট কুলঙ্গি আছে এবং কুলঙ্গির পরিমাপ .২৫ মিটার × .৪৫ মিটার। জমিদারের উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে জানা যায় পূর্বে এই মন্দিরে স্বর্ণের দেবদেবীর মূর্তি ছিল। স্বর্ণের মূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ার পর মাটির তৈরি দেবদেবীর মূর্তি দিয়েই এখানে এখনও বছরে একবার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভগৃহটি একটি অনুচ্চ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজের উপর সুউচ্চ শিখরটি নির্মিত হয়েছে। মঠের অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগ আস্তরযুক্ত। মঠের প্রবেশ পথ ব্যতীত বাকী সাত পার্শ্বে আস্তরের উপর প্রবেশ পথের নকশা এবং প্রবেশ পথের দুই পার্শ্বে সরু কলাম নকশা পরিলক্ষিত হয়। মঠের দ্বিতীয় অংশেও একই রকম নকশা এবং প্রত্যেক পার্শ্বের কোণে উত্থিত ইটের নকশা দেখতে পাওয়া যায়। মঠের সুউচ্চ শিখরটির প্রত্যেক পার্শ্বে ঢেউ নকশা এবং প্রত্যেকটি ঢেউয়ের মধ্যে দুটি করে ছিদ্র দেখা যায়। শিখরটি ক্রমশ সরু হয়ে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। শিখরের শীর্ষে ফিনিয়েলে আমলকী এবং ত্রিশূল এখনও অক্ষত আছে। এই সুউচ্চ দৃষ্টিনন্দন মঠটি শ্যামসিদ্ধির মঠের মতোই উচ্চতাসম্পন্ন।

মঠের গায়ে কোনো শিলালিপি পাওয়া না যাওয়ায় মঠটি কবে কার দ্বারা নির্মিত হয়েছে তা জানা যায় নি। মঠটি ১২৯২ বাংলা সনে ভূমিকম্পে পতিত হয় এবং ১২৯৩ বাংলা সনে পুনঃ নির্মাণ করা হয়। মঠের গায়ে আস্তরের উপর এই তথ্য লিপিবদ্ধ আছে।

সুউচ্চ মঠের দুই পার্শ্বে দুটি চৌচালা মঠ আছে। মঠ দুটি একই আয়তনের। পরিকল্পনায় আয়তাকার এই ইমারতের আয়তন ২.৫ মিটার × ২ মিটার এবং বহির্ভাগের পরিমাপ ৩ মিটার × ৩.৫ মিটার। দুটি মঠই .৯৫ মিটার উঁচু

Dhaka University Institutional Repository

ভিতের উপর নির্মিত হয়েছে।[১৬০] দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। উত্তর দিকের দেয়ালে ছোট একটি আয়তাকার প্যানেল আছে। প্যানেলটির নিচে আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে তিনটি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে একটি করে কুলঙ্গি রয়েছে। গর্ভ গৃহটির অভ্যন্তরভাগ একটি অনুচ্চ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজের উপর চৌচালা নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে মঠের অভ্যন্তরভাগ এবং বহির্ভাগ আস্তরযুক্ত ছিল বর্তমানে অভ্যন্তরের আস্তর অক্ষত থাকলেও বাহিরের আস্তর প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। পশ্চিম দিকের মঠের শীর্ষের কিছু অংশ ভেংগে গেছে। পূর্ব দিকের মঠের চৌচালা এখনও অক্ষত রয়েছে এবং শীর্ষে একটি শিকদন্ড চোখে পড়ে। ছোট মঠ দুটির ফাসাদে ছোট ছোট প্যানেল নকশা চোখে পড়ে। মঠ দুটির উচ্চতা প্রায় নয় মিটার। মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত মন্দির ও মঠগুলোর মধ্যে টংগীবাড়ি উপজেলার সোনারং মন্দিরটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষণের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া কোন মন্দির ও মঠ প্রততত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মুন্সিগঞ্জের দুর্গ ও অন্যান্য স্থাপত্য

সুলতানী শাসনামলে সোনারগাঁ ছিল বাংলার রাজধানী। মধ্যযুগের স্থাপত্যিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সেসময় সাধারণত শাসকদের পৃষ্টপোষকতায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রেই বেশী ধর্মীয় এবং ইহজাগতিক(secular) স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের প্রথম ভাগে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে বিক্রমপুরের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় এখানে দুই একটি ধর্মীয় স্থাপত্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও ইহজাগতিক স্থাপত্যের সন্ধান পাওয়া যায় নি। মুগল শাসন আমলে বার ভুঁইয়াদের পরাজিত করে বাংলার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে মুগল শাসকদের যথেষ্ঠ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল। মুগল শাসকরা বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সারা বাংলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুর্গ এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেতু নির্মাণ করে। মুগল শাসন আমলে মুন্সিগঞ্জে একটি দুর্গ এবং একটি সেতু নির্মিত হয়। এছাড়া ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বিক্রমপুরে কিছু সংখ্যক জমিদারের উদ্ভব হয়। এসব অধিকাংশ জমিদার বাড়ি বর্তমানে সরকারী সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। নিম্নে মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রধান দুটি ইহজাগতিক স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

ইদ্রাকপুর দুর্গ

(চিত্র :৩২-৩৩; ভূমিনকশা: ২৩)

ইদ্রাকপুর জলদুর্গটি মুন্সিগঞ্জ সদরে বিলুপ্ত ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে নদীটি বালুচরে পরিণত হয় এবং এখানে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে উঠে। দুর্গটি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে কিছুটা উচ্চে অবস্থিত। ইদ্রাকপুর দুর্গের অনতিদূরে এখনও ইছামতী নদীটির খাতের চিহ্ন বিদ্যমান।

ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলা সবসময়ই প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত। তাই বাংলার শাসকরা প্রায় স্বাধীন ভাবেই শাসন কার্য পরিচালনা করত। শুর শাসক শেরশাহ সর্বপ্রথম স্বাধীন সালতানাতের অবসান ঘটিয়ে আফগান শাসনের সূচনা করেন। ভারত উপমহাদেশে মুগলরা ছিল অপরিসীম শৌর্য বীর্যের অধিকারী। তথাপি বাংলায় তাদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে অনেক সময় লেগেছিল। সুবা বাংলা ছিল মুগল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক দূরবর্তী প্রদেশ।[১৬১] নদী পরিবেষ্টিত এ অঞ্চলে শক্তিশালী স্থল বাহিনী সম্বলিত মুগলরা খুব বেশী সুবিধা করতে পারছিল না। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের শাসন আমলে বাংলার আফগান শাসনকর্তা দাউদ খান কররাণী মুগল সেনা বাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার সাথে সাথে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে। এইসময় বাংলা মুগল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হলেও সে সময়ই মুগল শাসক আকবরের পক্ষে বাংলায় পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় শক্তিশালী জমিদারদের উত্থান ঘটেছিল। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বারভুঁঞা প্রধানরা স্ব-স্ব এলাকায় স্বাধীন হয়ে যায়।[১৬২]

নদী-নালা ও খাল-বিল বেষ্টিত এই দুর্গম এলাকায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জলপথ গুলো নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। জমিদারদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহী আফগানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুগলদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আরাকানী এবং পর্তুগীজ জলদস্যুরাও একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় আক্রমণ চালিয়ে পরিবেশ অশান্ত করে তুলেছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে সম্রাট আকবর নৌ শক্তি বৃদ্ধি করে বাংলায় মুগল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করেন। বাংলায় সুবাদার হিসেবে ইসলাম খান এর নিযুক্তি মুগল শাসনের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। মুগল সেনাপতি মানসিংহ অনেক স্থানীয় জমিদারদের পরাজিত করে বাংলায় মুগল কর্তৃত্বের সূচনা করেছিলেন। ইসলাম খান মুগল শাসনকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করেছিলেন। বার ভুঁঞাদের দমনের জন্য তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং এর নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তিনি সেনা ও নৌ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে জাহাঙ্গীর নগরের নিরাপত্তা বিধানে মনোনিবেশ করেন। প্রশাসনিক সদর দপ্তর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র ঢাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য মুন্সিগঞ্জ হতে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ঢাকায় নদী পথে আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নদীর তীরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে যে কয়টি মুগল দুর্গের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তার সবকটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক হতে জলদুর্গ নামে পরিচিত। রাজধানী ঢাকা যে কয়েকটি জলদুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল তন্মধ্যে অবস্থানগত গুরুত্বের দিক হতে ইদ্রাকপুর দুর্গ ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। "বলা যেতে পারে, ভাটি বা মেঘনার মোহনা থেকে ঢাকা অভিমুখী আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে এই দুর্গটি ছিল প্রথম সারির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।[১৬৩] বস্তুত মুগলরা যে বাংলার জলপথগুলো নিয়ন্ত্রণ করে বাংলায় মুগল শাসনের স্থায়ীত্ব আনয়ন করেছিল তার মূলে ছিল এ অঞ্চলে তাদের উদ্ভাবিত জলদুর্গ।[১৬৪]পাথরের দুস্প্রাপ্যতা হেতু উত্তর ভারতে নির্মিত মুগল দুর্গ গুলোর সাথে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গ গুলোর বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। *বাহার-স্থান-ই-গায়েবী* গ্রন্থ হতে আমরা বাংলায় মাটির দুর্গের কথা জানতে পেরেছি। স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ আহমদ হাসান দানী বাংলায় অসংখ্য মাটির দুর্গ গড়ে উঠার কারণ হিসেবে বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কথা বলেছেন।[১৬৫] বাংলার দুর্গগুলো স্থানীয় উপাদান দ্বারা তৈরী হলেও খুব সম্ভবত যথেষ্ঠ মানসম্পন্ন ছিল এবং অল্পসময়ের মধ্যেই তৈরী করা যেত।

ইদ্রাকপুর দুর্গটি ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে মুন্সিগঞ্জ সদরে অবস্থিত। মগ ও জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে ঢাকাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বা জলপথ পাহারা দেওয়ার জন্য ইদ্রাকপুর দুর্গটি নির্মিত হয়। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে একটি দুর্গকে জলদুর্গ বলা চলে সেসব বৈশিষ্ট্যগুলো ইদ্রাকপুর দুর্গে বিদ্যমান থাকায় এটি প্রকৃতপক্ষে জলদুর্গের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ইদ্রাকপুর দুর্গটি পরিকল্পনায় আয়তাকার এই দুর্গটি দুটি অংশে বিভক্ত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা অংশটির দৈর্ঘ্য ৮৬.৮৭ মিটার[১৬৬] এবং প্রস্থ ৫৯.৬০মিটার।[১৬৭] দুর্গটির চারকোণে চারটি সম আয়তনের গোলাকার পর্যবেক্ষণ বুরুজ আছে। বুরুজগুলোর ব্যাস ৫.৫০ মিটার এবং উচ্চতা ৪.৬০ মিটার।[১৬৮] দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য উত্তর দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে খিলান বিশিষ্ট একটি মাত্র প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথটি অতি সাধারণ এবং জাঁকজমক বিহীন। প্রবেশ তোরণটি বর্ধিত আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত। যার উপর অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। প্রবেশ তোরণটি ২.১০ মিটার প্রশস্ত[১৬৯] এবং উভয় পার্শ্বে ছোট বড় প্যানেল নকশা পরিলক্ষিত হয়। দুর্গ প্রাচীর কমবেশী ০.৮৮ মিটার[১৭০] পুরু। পূর্ব পার্শ্বের দুর্গ প্রাচীর ১০.৩ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত[১৭১] এবং দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য পূর্ব পার্শ্বটির তুলনায় কিছুটা কম। উত্তর দিকের বর্ধিত অংশটি খুব

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত মুগল সৈন্যদের স্থান সংকুলানের জন্য নির্মিত হয়েছিল। দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের উচ্চতা ১.২২ মিটার।[১৭২]

ইদ্রাকপুর দুর্গটি আয়তনে নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা দুর্গ অপেক্ষা ছোট এবং হাজীগঞ্জ দুর্গের প্রায় সমান। দুর্গ প্রাকারে মারলন নকশা এবং প্রাকারের গায়ে গোলা নিক্ষেপের জন্য ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির ফোকর আছে। ইদ্রাকপুর দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীর, গোলা নিক্ষেপের ফোকর, প্যারাপেট দেয়াল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সাথে সোনাকান্দা ও হাজীগঞ্জ দুর্গের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়।

ইদ্রাকপুর দুর্গটি পূর্ব ও পশ্চিম দুটি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব পার্শ্বে একটি বৃত্তাকার বেদী রয়েছে। বেদীতে আরোহণের জন্য ১.৯ মিটার প্রশস্ত এবং ১৮.২৬ মিটার দীর্ঘ একটি সিঁড়িপথ আছে।[১৭৩] দূর্গের পশ্চিম দিকের তুলনায় পূর্ব দিকের বিস্তৃতি কম। এই অংশের দৈর্ঘ্য ৭৭ মিটার প্রস্থ ৪৪মিটার।[১৭৪] পূর্ব ও পশ্চিম এই দুটি অংশের সমন্বয়েই মূল দুর্গটি নির্মিত হয়েছে। পূর্ব দিকের অংশটিতে একটি এবং পশ্চিম দিকের চারকোণে চারটি মোট পাঁচটি প্রান্ত বুরুজ পর্যবেক্ষণ চৌকি হিসেবে নির্মিত হয়েছে। আক্রমণকারীর গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যই এই পর্যবেক্ষণ চৌকি গুলো নির্মিত বলে অনুমিত হয়। অভ্যন্তর ভাগ খুব সম্ভবত সৈন্যদের আশ্রয়স্থল ছিল। সাধারণত বর্ষাকালে বহিরাক্রমণ প্রতিহত করতে হতো এবং সে সময় বুরুজের অভ্যন্তর ভাগে ফাঁকা অংশে সৈন্যরা আশ্রয় গ্রহণ করত বলে ধারণা করা যেতে পারে। পূর্ব দিকের বেদীর উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ চৌকিটি গোলাকার এবং ৬.১০ মিটার প্রশস্থ। বৃত্তাকার বেদীটি এই দুর্গের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সোনাকান্দা দুর্গে এধরণের একটি বেদী দেখা গেলেও উচ্চতা ও আয়তনের দিক থেকে ইদ্রাকপুর দুর্গের বেদীটি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা বাংলার অন্য দ্বিতীয় কোন দুর্গে প্রত্যক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করা যায় না।[১৭৫] ভূমি হতে বৃত্তাকার বেদীটি ৯.১৪ মিটার উঁচু এবং এর ব্যাস ৩২.৫ মিটার। এই দুর্গের কেন্দ্রীয় বৃত্তাকার বেদীর এক পার্শ্বে উপর থেকে নিচের দিকে একটি সিঁড়ি পথ আছে। এই সিঁড়ি পথ দিয়ে খুব সম্ভব ভূ-গর্ভস্থ কুঠুরীতে যাওয়া যেত। এই কুঠুরীটি কি কাজে ব্যবহৃত হত সেই কারণটি সঠিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের অভাবে আজও আমাদের অজ্ঞাত। কক্ষটি খুব সম্ভবত দুর্গের অস্ত্রগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশ *ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার* (ঢাকা) উল্লেখ করা হয়েছে যে, "Just at the foot of the drum a small magazine is seen."[১৭৬] এই বৃত্তাকার বেদীটি খুব সম্ভবত কামান স্থাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। ইদ্রাকপুর দুর্গের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি পুকুর আছে। অনুমান করা যেতে পারে যে দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সৈন্যদের পানি সরবরাহের জন্যই এই পুকুরটি খনন করা হয়েছে। এই দুর্গটি নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা ও হাজীগঞ্জ দুর্গের মতোই ইট, চুন সুরকি দ্বারা নির্মিত। এই দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের অংশ বিশেষ এবং কোণের পাঁচটি বুরুজ লাল বেলে পাথরে নির্মিত বলে যে তথ্যটি "*A Documented history of Archaeological Back ground of Eastern Pakistan Cricle*"[১৭৭] - এ উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে তা সঠিক নয়। বাস্তব পর্যবেক্ষণের অভাবে এধরণের ভুল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

ইদ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ তারিখ সংবলিত কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি। ১৮৯৫ সালে প্রণীত *লিস্ট অব এ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্ট ইন বেঙ্গল সার্ভে রিপোর্ট* থেকে জানা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় এই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল।[১৭৮] মীরজুমলা বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলার প্রতিরক্ষা এবং যাতায়াত ব্যাবস্থার উন্নয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। ইদ্রাকপুর জলদুর্গ নির্মাণ তার সামরিক পরিকল্পনারই অংশবিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

এই দুর্গটি সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্তির অংশবিশেষ। ১৯০৪ সালের আইন অনুযায়ী ১৯০৯ সালে ইদ্রাকপুর দুর্গটিকে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে ঘোষনা করা হয়।[১৭৯]বৃটিশ শাসন আমলে দুর্গ এলাকায় মুন্সিগঞ্জ মহাকুমা কারাগার এবং বৃত্তাকার বেদীর উপর মহাকুমার প্রশাসনিক কর্মকর্তার বাংলো নির্মিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাধ্যমে উক্ত অসংগতিপূর্ণ নির্মাণাদি অপসারণের নির্দেশ দেন কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই নির্দেশটি কার্যকর হয় নি। সম্প্রতি এ দুর্গে নির্মিত কক্ষাদিতে বসবাসকারীদের উঠিয়ে দিলেও এখনও এসব অনাকাংখিত কক্ষাদি আমাদের চোখে পড়ে।

বাংলাদেশের যে স্বল্প কয়েকটি ইমারত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তন্মধ্যে ইদ্রাকপুর দুর্গটি অন্যতম। স্থাপত্যিক ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা সাধারণত ধর্মীয় স্থাপত্য এবং জাগতিক স্থাপত্য- এ দু ধরণের স্থাপত্য ইমারতের সন্ধান পাই। ধর্মীয় স্থাপত্য সাধারণত স্ব-স্ব ধর্মের লোকদের দ্বারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জাগতিক স্থাপত্য সংরক্ষণের জন্য কেউ আগ্রহী হয় না; ফলে জাগতিক স্থাপত্য সংস্কার সংরক্ষণ ও অবহেলার জন্য খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। দুরদশাগ্রস্থ ইদ্রাকপুর দুর্গ সাধারণের বসবাস, মানুষের সচেতনতার অভাব বা জাগতিক স্থাপত্যের প্রতি মানুষের অবহেলার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে চলেছে।

স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ আহমেদ হাসান দানীর মতে এই দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীর দুর্বল।[১৮০] ইদ্রাকপুর দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল নদী পথে আক্রমণ কারীদের প্রতিহত করার জন্য। সুতরাং দুর্গের শক্তিশালী দুর্গ প্রাচীর প্রতিরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।[১৮১] বুরুজ থেকে নদীপথে আক্রমণকারীদের উপর গোলা নিক্ষেপ করার জন্য শক্তিশালী উঁচু দুর্গ প্রাচীর বরং নিরাপত্তার অন্তরায়।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য যুগের বাংলার দুর্গ স্থাপত্যের বিকাশ পর্যলোচনায় দেখা যায় ইদ্রাকপুর দুর্গ অবরোধ দুর্গ বা প্রাসাদ দুর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিজেদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে মুগলরা এই ধরণের জলদুর্গ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। যা তাদের শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করেছিল। মুগল আমলে উত্তর ভারতে যে রাজকীয় দুর্গ স্থাপত্যের বিকাশ ঘটেছিল বাংলায় তা ছিল অচল। বরং নদীবিধৌত বাংলায় জলদুর্গ মুগলদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মীর কাদিম ব্রীজ

(চিত্র : ৩৪; ভূমিনকশা : ২৪)

মুন্সিগঞ্জে মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা স্থাপত্যের মধ্যে যেসব ইমারত এখনও বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে মীরকাদিম ব্রীজ অন্যতম। মীর কাদিম খালের উপর এই সেতুটি নির্মিত হয়েছে। এই খালটি আব্দুল্লাহপুর গ্রামের সাথে রামপালের পানাম গ্রামের সংযোগ সাধন করেছে। Mughal Governors of course built many high ways, roads, bridges and causeways.[১৮২] সুবাদার মীর জুমলার শাসন আমলে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থার জন্য বাংলায় বেশ কটি সেতু নির্মিত হয়েছিল। তার মধ্যে মীর কাদিম সেতু সর্ব বৃহৎ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনসাধারণের মতে হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের আমলে সেতুটি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সেতুটির নির্মাণ পদ্ধতি ও স্থাপত্য রীতি প্রচলিত স্থানীয় মতামতকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। সেতুটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যান্য মুগল সেতুর বৈশিষ্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে মীর কাদিম সেতুটি মুগল আমলে নির্মিত হয়েছিল।

মীর কাদিম সেতুর দৈর্ঘ্য ৫৩ মিটার এবং ৩১ মিটার প্রশস্ত।[১৮৩] সেতুটি তিনটি খিলান সহযোগে গঠিত। খিলানগুলো চতুর্কেন্দ্রিক এবং আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। কেন্দ্রীয় খিলানের মধ্যবর্তী বিস্তৃতি ৪.৪০ মিটার এবং পার্শ্ববর্তী খিলান দুটির বিস্তৃতি ২.২৫ মিটার। কেন্দ্রীয় খিলানটি খালের পানির স্তর থেকে ৯.৪০ মিটার উচ্চে নির্মিত হয়েছে। প্রদত্ত খিলানের পরিমাপ থেকে প্রতীয়মান হয় কেন্দ্রীয় খিলানটি পার্শ্ববর্তী খিলান দুটি অপেক্ষা প্রশস্ত তর এবং উঁচু। কারণ এই স্থান দিয়ে নৌকা এবং বাণিজ্য তরী যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারে। কেন্দ্রীয় খিলানটির দুইপার্শ্বের স্তম্ভ থেকে উত্থিত। স্তম্ভ গুলোর উপর চতুর্কেন্দ্রিক খিলান নির্মিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী খিলানগুলোও অষ্টকোণাকার স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে এবং স্তম্ভ গুলো খিলানের স্প্যানড্রিলের উপর উঠে গেছে এগুলো কিউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তম্ভ গুলো পার্শ্ববর্তী গুলোর তুলনায় কম উঁচু। স্থানীয় সূত্র হতে জানা যায় যে পূর্বে সেতুর দুইপার্শ্বে গোলাকার স্তম্ভ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা মাটির নিচে চলে গেছে। স্তম্ভের নিম্নাংশ পানি কাটার জন্য খাঁজকাটা করে তৈরি করা হয়েছে। সেতুটির দুইদিকে ছয়টি করে স্তম্ভ ছিল। মধ্যবর্তী অংশটি উটের কুঁজের মত উঁচু এবং দুইদিক ঢালু; যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেতুর দুইদিকে অনুচ্চ রেলিং আছে। এই সেতুটি সম্পূর্ণ ভাবে ইটের তৈরী এবং অনেক বার মেরামত করা হয়েছে। বর্তমানে সেতুটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে সংরক্ষিত। মীরকাদিম সেতুর স্থাপত্যিক বৈশিষ্টের সাথে সোনারগাঁয়ের পানাম পুল ও পানাম নগর পুলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় সেতুই সতর শতকে নির্মিত হয়েছে। দৈর্ঘ্যে পানাম সেতু মীর কাদিম সেতু অপেক্ষা কিছুটা কম হলেও উভয় সেতুই চতুর্কেন্দ্রিক

Dhaka University Institutional Repository

খিলান সহযোগে গঠিত। যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই দুই সেতুর মধ্যবর্তী খিলান পার্শ্ববর্তী খিলান দুটি অপেক্ষা বেশী প্রশস্ততর এবং উঁচু। এই দুটি সেতু অবস্থান গত দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্মিত হয়েছে। এই দুটি সেতু ছাড়াও মুগল আমলে অপেক্ষাকৃত ছোট পানাম নগর পুল, পিঠাওয়ালীর পুল, চাঁপাতলীর পুল এবং পাগলার পুল নির্মিত হয়েছে। নির্মাণগত বৈশিষ্ট্যের দিক হতে প্রত্যেকটি সেতুর সাথে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি কিছুটা বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। যেমন পাগলার পুল চতুর্কেন্দ্রিক খিলান সহযোগে গঠিত হলেও সেতুর প্রারম্ভে উভয় পার্শ্বে দুটি বদ্ধ খিলান আছে।[১৮৪]খিলানের স্প্যানড্রিলে ফুলেল নকশা এবং সেতুর অবরোহন ও আরোহন স্থলে দুটি উঁচু তোরণ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বুরুজ রয়েছে। পানাম সেতু বা মীর কাদিম সেতুতে এ ধরণের কোনো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। মীরকাদিম সেতু যদিও ব্যক্তি মালিকানাধীন ০.৫ শতাংশ জমির উপর নির্মিত হয়েছে। জমির মালিকরা সবাই হিন্দু এবং বর্তমানে বাংলাদেশে না থাকায় সেতুটি সংরক্ষণের দায়িত্ব নেয় সরকার। মীর কাদিম সেতুর দাগ নম্বর ১৬৮ ও সংরক্ষণ নম্বর এবং তারিখ এল বি/ ১এ- ১৫-৭-১৯৭৭। বর্তমানে এই সেতুর উপর দিয়ে কোনো যানবাহন যাতায়াত করতে দেওয়া হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বিক্রমপুর প্রাচীন বঙ্গ জনপদের একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। প্রাচীনকাল হতেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ইতিহাসের সাথে বিক্রমপুরের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। নদীর ঘন ঘন গতিপথ পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, একাধিকবার প্রশাসনিক কেন্দ্রের রদবদল এবং শাসকদের অবহেলা ইত্যাদি কারণে কালের বিবর্তনে বিক্রমপুর স্বীয় অতীত ঐতিহ্য ও জৌলুস হারিয়ে সাধারণ পরগনায় পরিণত হয়। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় অনেক ইমারত নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এসব ইমারত কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইতিহাস পুনর্গঠনের অন্যতম উপাদান স্থাপত্য। উত্তরবঙ্গে এবং দক্ষিণবঙ্গে কিছু কিছু বৌদ্ধ বিহার পাওয়া গেলেও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুরে এরূপ প্রাচীন কোন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু সারা বিক্রমপুরে প্রচুর বৌদ্ধ, হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি, ভাস্কর্য্য, শিলালিপি এবং মুদ্রা ইত্যাদি পাওয়া গেছে যা দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়তা করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের শেষ হিন্দু শাসক দনুজারায় দশরথদেব বিক্রমপুর হতে রাজধানী সোনারগাঁয়ে স্থানান্তর করায় ইতিহাসে বিক্রমপুর প্রথমবারের মতো নগরীর মর্যাদা হারায়।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলিমদের আগমন বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুসলিম শাসকরা সোনারগাঁকে প্রশাসনিক কাঠামোর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে ফলে বিক্রমপুর সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত পরগনায় পরিণত হয়। মুসলিম শাসকদের আগমনে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। এতদিন যে উপাদান

Dhaka University Institutional Repository

গুলো বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছিল তা ছিল একান্তই ভারতীয় হিন্দু বৌদ্ধ উপাদান। মুসলিমদের বয়ে আনা সাংস্কৃতিক উপাদানের সাথে বাংলার প্রচলিত উপাদানের সংমিশ্রন ঘটায় বাংলায় এক নতুন ধারার স্থাপত্য বিকাশ লাভ করে। এ অঞ্চলে মুসলিম শাসকদের আগমনের অনেক পূর্বেই সুফী সাধকগণ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য আসেন। ইসলামের সাম্য মৈত্রীর বানীতে মুগ্ধ হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে বাংলায় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সর্বত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসকগণ তাদের সাথে যে নির্মাণ কৌশল বয়ে এনেছিলেন তার সাথে এদেশের নির্মাতা ও কারিগররা পরিচিত ছিল না। এই গুলোর মধ্যে খিলান, গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বখতিয়ার খলজীর বঙ্গ বিজয়ের অনেক পরে মুসলিম শাসকরা বিক্রমপুর তাদের শাসনাধীনে আনেন। ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ শাসক জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহের শাসনামলে বিক্রমপুরের রামপালে বাবা আদম জামে মসজিদ (১৪৮৩ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত হয়। জামে মসজিদ সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রে নির্মিত হত। এ মসজিদটি ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার মসজিদ। সুলতানী আমলে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের যে ধারা বিকশিত হয়েছিল তার পরিপূর্ণ বিকশিত রূপটি এই মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। বাবা আদম মসজিদটি বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ধারন করে আছে যার প্রভাব বাংলার পরবর্তী মসজিদ স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়। হোসেনশাহী শাসন আমলে বিক্রমপুরের রিকাবী বাজারে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বর্গাকার মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের দেয়াল স্থুলাকার এবং অনুচ্চ গম্বুজ নির্মাণে যে রীতিটি অনুসৃত হয়েছে তা 'বাংলা পেনডেনটিভ' নামে পরিচিত। সুলতানী আমলে সারা বাংলায় বিকশিত স্থাপত্যের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইটের সার্বজনীন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বাংলায় পাথরের স্বল্পতার জন্য সাধারণত পাথরের সীমিত ব্যবহার লক্ষণীয়। যে সব ইমারতে পাথরের ব্যবহার দেখা যায় তা খুব সম্ভব পূর্ববর্তী ইমারত হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ঢালু ছাত, বক্রাকার কার্নিশ, পুরু দেয়াল, ইমারতের চারকোণে অনুচ্চ স্থূল অষ্টাভুজাকার ব্যান্ডযুক্ত পার্শ্ববুরুজ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়। পার্শ্ববুরুজের এই বৈশিষ্ট্যটি মূলত গ্রাম বাংলার কুঁড়েঘরের বাঁশের চারটি খুঁটি থেকে গৃহীত। দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান, জুল্লায় দন্ডায়মান স্তম্ভের ব্যবহার, প্রবেশ পথের বরাবর সমসংখ্যক মিহরাব, অনুচ্চ গোলায়িত গম্বুজ, ছাত নির্মাণে পান্দানতিভ, স্কুইঞ্চ, ভল্টের ব্যবহার, অলংকরণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টেরাকোটা অলংকরণ, ঝুলন্ত শিকলঘন্টা নকশা, অগভীর খোদাই নকশা, মিনা করা টালী, অ্যারাবেস্ক ও জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদি বাংলার সুলতানী স্থাপত্যে দেখা যায়। এসময়ে নির্মিত ইমারত গুলোতে শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থা, রুচিবোধ এবং সৌন্দর্য প্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতানী শাসকদের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার বহি:প্রকাশ ঘটে সে সময়ে নির্মিত স্থাপত্য সমূহে। মুগল শাসন আমলের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। মুগল শাসন আমলের প্রথমদিকে বাংলায় মুগলদের নির্মিত তেমন কোন স্থাপত্য পরিলক্ষিত হয় না। পরবর্তীতে মুগল সুবাদারদের তত্ত্বাবধানে বাংলায় তাদের স্থাপত্য গড়ে উঠে। সুলতানী আমলে বাংলায় সুলতানী স্থাপত্যের একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র ধারা দেখা যায় কিন্তু মুগল আমলে নির্মিত ইমারতে সেই ধারাটি অব্যাহত থাকে না। এসময় রাজকীয় মুগল স্থাপত্যের অনুকরণে এখানে বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হয়। সুলতানী আমল থেকে মুগল আমলে উত্তরণের সময় যুগসন্ধি লগ্নে| সারা বাংলায় কিছু মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদ গুলোতে সুলতানী এবং মুগল উভয় আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার

Dhaka University Institutional Repository

কোট গাঁ গ্রামে এই ধরণের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বর্গাকার মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদটিতে একদিকে যেমন সুলতানী আমলের দ্বি-কেন্দ্রিক কৌনিক খিলান, স্কুইঞ্চ পান্দান্তিভের ব্যবহার, উল্টানো পেয়ালা আকৃতির গম্বুজ, বক্রাকার কার্নিশ দেখা যায় তেমনি ছত্রীযুক্ত (kiosk) অষ্টভুজাকার পার্শ্ববুরুজ, মসজিদের ফাসাদে এবং বহির্ভাগের দেয়ালে আয়তাকার প্যানেল এবং প্যানেলের মধ্যে খিলান নকশা ইত্যাদি মুগল আমলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই মসজিদটি সম্ভবত মুগল শাসন আমলের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছে। তাই এই মসজিদে সুলতানী এবং মুগল স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রন পরিলক্ষিত হয়। মুগল আমলে নির্মিত ইমারতে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলো দেখা যায় সেগুলো বেশীরভাগই তিন গম্বুজ বা এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার, পার্শ্ববুরুজগুলো কার্নিশের উপর উঠে গেছে যা ছত্রী (kiosk) দ্বারা আচ্ছাদিত, পিপার (drum) উপর নির্মিত সুডৌল বৃত্তাকার গম্বুজ, গম্বুজ নির্মাণে বর্গাকার অংশ এবং গম্বুজের বৃত্তের মাঝখানে অবস্থান্তরের পর্যায়ে অগভীরভাবে সংস্থাপিত কৌণিক ভল্টের ব্যবহার, সমান্তরাল কার্নিশ, আস্ত রযুক্ত দেয়াল, দেয়ালে টেরাকোটা অলংকরণের পরিবর্তে ছোট ছোট বর্গাকার এবং আয়তাকার অবতল প্যানেল ও পলেস্তরার মাধ্যমে স্ট্যাকো নকশা প্রকাশ পায়। অধিকন্তু পদ্মপাঁপড়ির মারলন নকশা, চক্রাকার ফুল-লতা-পাতার অনুকৃতি, এবং গম্বুজের শীর্ষে ফিনিয়েলের ব্যবহার ইত্যাদি। সিরাজদিখানের পাথরঘাটায় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদের নির্মাণ রীতির সাথে শায়েস্তা খানের সময় নির্মিত মসজিদ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুগল পরবর্তী সময়ে মুন্সিগঞ্জ জেলায় বলালী মসজিদ, বাঁশবাড়ী মসজিদ, আউটশাহী মসজিদ, উত্তর রাঙামিলা মসজিদ, খেরুয়া মসজিদ মস্তরীপাড়া মসজিদ এবং

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এই মসজিদগুলো সম্ভবত মুগল পরবর্তী জমিদারী শাসন আমলে নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদ গুলোর মধ্যে বিশেষ করে বলালী এবং বাঁশবাড়ী মসজিদ আয়তনে খুবই ছোট। এই মসজিদ গুলো ছিল খুব সম্ভব পরিবার কেন্দ্রিক মসজিদ এবং এখানে চারজনের বেশী মানুষের স্থান সংকুলান হত না। বলালী মসজিদ বর্তমানে সম্পূর্ণ ভঙ্গুর অবস্থায় বিদ্যমান। উত্তর রাঙামিলা ও খেরুয়া মসজিদ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আউটশাহী মসজিদও বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান। এই মসজিদটিও অদূর ভবিষ্যতে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে অনুমিত হয়। মশুরীপাড়া জামে মসজিদ এবং দক্ষিণ কাজী কসবা মসজিদ এখনও বিদ্যমান থাকলেও স্থানীয় সংস্কারকারীদের দ্বারা সংস্কার করায় এর আদি বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে। মুগল আমলে রাজধানী ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য ঢাকার আশেপাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কয়েকটি দুর্গ ও সেতু নির্মিত হয়। অবস্থান গত দিক হতে মুন্সিগঞ্জের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল তাই ইদ্রাকপুরে একটি জলদুর্গ নির্মিত হয়। নির্মাণ কৌশল এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক হতে এই জলদুর্গটির সাথে নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা এবং হাজীগঞ্জ দুর্গের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ইদ্রাকপুর দুর্গ তুলনামুলকভাবে এই দুটি দুর্গ অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য মুগল সুবাদারগণ মুন্সিগঞ্জ সোনারগাঁ, এবং ঢাকায় কয়েকটি সেতু নির্মাণ করেন। মুন্সিগঞ্জের মীর কাদিম সেসময় বৃহৎ নদী বন্দর ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার জন্য মীর কাদিমে একটি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতুটি স্তম্ভের উপর চর্তুকেন্দ্রিক খিলানের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের মীরকাদিম সেতুর সাথে সোনারগাঁয়ের পানাম সেতুর বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থাকায় এই দুটি সেতু একই সময়ে নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুগল আমলে মুন্সিগঞ্জে দুর্গ এবং সেতু নির্মিত হওয়ায় ধারণা করা যায় তখন মুন্সিগঞ্জের অবস্থানগত গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল। এছাড়া মুন্সিগঞ্জে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য মন্দির। এই মন্দিরগুলোর মধ্যে একটি দোচালা এবং একটি আটচালা মন্দির ব্যাতীত অবশিষ্ট মন্দিরগুলো শিখর রীতিতে নির্মিত হয়েছে। মুন্সিগঞ্জের দোচালা অবয়বের রাধা গোবিন্দ মন্দিরটি সম্ভবত ষোড়শ শতকে নির্মিত হয়েছিল। একসময়ে এই মন্দিরটি ছিল টেরাকোটা অলংকরণে সমৃদ্ধ। বর্তমানে এ মন্দিরে আদি টেরাকোটা অলংকরণের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আর চোখে পড়ে না। এই এলাকার মন্দিরগুলো স্থানীয় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পূর্বে স্থানীয় জমিদারের মৃত্যুর পর যেখানে দাহ করা হত সেই ভস্মের উপর মঠ নির্মাণ করা হত। মুন্সিগঞ্জে এই শ্রেনীর মঠের সংখ্যাই বেশী। মুন্সিগঞ্জের অধিকাংশ মঠ সুউচ্চ এবং পরিকল্পনায় অষ্টভুজাকার ও আয়তাকার। এখানে নির্মিত মঠগুলোতে আমরা সুলতানী, মুগল এবং উপনিবেশিক শাসনামলের স্থাপত্য রীতির সমন্বয় দেখতে পাই। এই মঠগুলোর যে সব সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলো- দ্বি-কেন্দ্রিক এবং চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের ব্যবহার, মঠের গায়ে বর্গাকার আয়তাকার প্যানেল নকশা, প্যানেলের মধ্যে বদ্ধ দরজা এবং খিলান নকশাসহ বিভিন্ন ধরণের অলংকরণ, শিখরে ধনুক আকৃতির নকশা, শিখর গাত্রে ফোকর, ফিনিয়াল ও শীর্ষে শিখরের চূড়ায় আমলকী, চক্র ইত্যাদি নকশা পরিলক্ষিত হয়। মুন্সিগঞ্জের মাইজপাড়ায় একটি মঠ পাওয়া গেছে। মঠটি কবে নির্মিত হয়েছে তা জানা না গেলেও মঠের প্রবেশ পথের পাশে বাংলায় লেখা আছে মঠটি ১২৯২ (বাংলা) সনে ভূমিকম্পে পতিত হলে (১২৯৩) বাংলা সনে পুন:নির্মাণ করা হয়। এই সুউচ্চ মঠের দুই পাশে জমিদারের দুই স্ত্রীর দুটি আয়তাকার মঠ রয়েছে; এবং মঠগুলো চৌচালার আদলে নির্মিত। এই মঠ পুন:নির্মাণের অনেক পরে হাঁসাড়া এবং সরকার মঠ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত হয়েছে কিন্তু এই মঠ সম্পর্কে কোনো তথ্য *Archaeological Survey Report Munshiganj District* এ প্রদান করা হয় নি। মুন্সিগঞ্জের ইতিহাস ও স্থাপত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রমপুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীন আমল হতে শুরু করে মুগল আমল পর্যন্ত এই স্থানের কমবেশী প্রশাসনিক প্রাধান্য ছিল। মুন্সিগঞ্জের প্রত্নবস্তু, বিভিন্ন ধরণের স্থাপত্য নিদর্শন এ অঞ্চলের উন্নত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার স্বাক্ষ্য বহন করে। কালের গতিতে মুন্সিগঞ্জের অনেক স্থাপত্য নিদর্শনই বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে যে অল্পসংখ্যক নিদর্শন টিকে আছে সেগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নবায়নের ব্যবস্থা করা উচিত। যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন এ অঞ্চলের স্থাপত্য বিষয়ে ভবিষ্যতে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার সুযোগ অবারিত থাকবে তেমনি অতীত ঐতিহ্যের স্মারক দর্শনীয় নিদর্শনগুলো ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৫

২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৬৫

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব), কলিকাতা, ১৪০০ (বাংলা),পৃ. ১১০

৪. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব* (১২০৪-১৩৩৮), কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৫৩

৫. আব্দুর রহিম ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৫।

৬. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬

৭. যতীন্দ্র মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কলিকাতা, ২০০০, পৃ. ৯

৮. আ.ক.ম. যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ.৪০৬

৯. Md. Abu Musa, *Archaeological Survey Report Munshiganj District*, Dhaka, 2000, p. 1

১০. Alexander Cunningham, *Archaeological Survey of India, Report of a tour in Bihar and Bengal in 1879-80 from Patna to Sunargaon vol- xv*, Delhi, 1999, p. 131

১১. Md. Abu Musa, *op. cit.* p. 1

১২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

১৩. যতীন্দ্র মোহন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯

১৪. আ.ক.ম. যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

১৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬

১৬. James Taylor, *Topography of Dacca*, Calcutta, 1940, p. 100

১৭. হিমাংশু মোহন শর্মা, *বিক্রমপুর*, ১ম খন্ড, নারায়ণগঞ্জ, ১৩৩৮ (বাংলা), পৃ. ৩

১৮. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২

১৯. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৩

২০. Bimal kumar Datta, *Bengal Temples*, New Delhi, 1975, p. 6

২১. Alexander Cunningham, *op. cit*, p. 146

২২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭

২৩. *ঐ*,

২৪. *ঐ*, পৃ. ৮

২৫. A. M. Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*, Dacca, 1967, p. 176

২৬. সাক্ষাৎকার, মো: হান্নান, *দৈনিক জনকণ্ঠ* ২০ মে, ২০০০

২৭. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস* (প্রথম সংস্করণ), কলিকাতা, ১৩১৬(বাংলা), পৃ. ১৭৪

২৮. *ঐ*, পৃ. ১৭৬

২৯. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (সংশোধিত সংস্করণ), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২

৩০. রাখাল দাস বন্দেপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস* (আদি পর্ব), কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৩০

৩১. A. M. Chowdhury, *op.cit*, p. 139

৩২. আবদুল মমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৫

৩৪. আবদুল মমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬

৩৫. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৫

৩৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫

৩৭. *ঐ*,

৩৮. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৮

৩৯. A. M. Chowdhury, *op.cit* , p. 176

৪০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০

৪১. আবদুল মমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪

৪২. *ঐ*, পৃ. ৯৫

৪৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০

৪৪. আবদুল মমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬

৪৫. R. D. Banerji, *Epigraphia Indica,* Vol. xiv, Calcutta, 1917- 1918, pp. 156. 163

৪৬. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৫

৪৭. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩০

৪৮. R. D. Banerji, *Epigraphia Indica,* Vol. xv. Calcutta, 1920, P. 278

৪৯. আবদুল মমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮

৫০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫৩

৫১. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০

৫২. আবদুল মমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১২

৫৩. *ঐ*, পৃ. ১১৩

৫৪. মীনহাজ- ই- সিরাজ, *তবকাত-ই- নাসিরী*,(আবুল কালাম

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পা.), ঢাকা, ১৯৮৩,পৃ.২৬৩

৫৫. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৭

৫৬. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯

৫৭. মীনহাজ- ই- সিরাজ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৭৮

৫৮. আবদুল মমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১১৭

৫৯. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২৯৬

৬০. জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই- ফিরোজশাহী*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭০-৭১

৬১. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০৪

৬২. Henry Blochmann, *Contributions to the geography and history of Bengal*, Calcutta, 1873, p. 80

৬৩. Habiba Khatun, *Sonargoan Its History & Monuments*, Ph, D. Thesis (Unpublished), Dhaka University, 1987, p.132

৬৪. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (প্রথম সংস্করণ), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬

৬৫. *ঐ*, পৃ. ১১২

৬৬. James Taylor, *op. cit*, p. 94

৬৭. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস:মোগল আমল*, ১ম খন্ড,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭, পৃ. ২০২

৬৮. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (প্রথম সংস্করণ), পূর্বোক্ত পৃ. ১২৭

৬৯. *ঐ*, পৃ. ১৪৯

৭০. W. W. Hunter, *Statistical Accounts of Bengal*, Delhi, 1974, p. 139

৭১. উপজেলা বার্তা, মুন্সিগঞ্জ , ১৯৯০, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

৭২. নীহার রঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৩

৭৩. মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের উত্তর রাঙামিলা গ্রামে অবস্থিত এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং লৌহজং উপজেলার কুমারভোগ ইউনিয়নের খেরুয়া গ্রামের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

৭৪. Abu Musa, *op. cit,* p. 9

৭৫. A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca, 1961, p. 156

৭৬. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian inscriptions of Bengal,* Dhaka, 1992. p. 203

৭৭. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (প্রথম সংস্করণ), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২

৭৮. Henry Blochmann, *oP.cit,* p. 80

৭৯. বাস্তব পর্যবেক্ষণ, মে, ২০০২

৮০. Abu Musa, *op.cit,* p. 16

৮১. *Ibid.*

৮২. বাস্তব পর্যবেক্ষণ, জানুয়ারী, ২০০১

৮৩. চিত্র- ৭. পৃ.

৮৪. Abu Musa, *op.cit,* p. 16

৮৫. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (প্রথম সংস্করণ), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮০

৮৬. *ঐ*,

৮৭. এই মসজিদের সমস্ত পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

৮৮. *ঐ*,

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. মোহাম্মদ শামসুল হক, 'ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে বাংলার.... অবস্থান', *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৮৮

৯০. Abu Musa, *op.cit,* p. 23

৯১. দেয়ালের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

৯২. *ঐ,*

৯৩. আবুল ফয়েজ, ঢাকার চক বাজার এলাকার স্থাপত্যকীর্তি এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ(অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ, ৩১

৯৪. *ঐ*, পৃ. ৬২-৬৩

৯৫. বারান্দার পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

৯৬. Abu Musa, *op.cit,* p. 18

৯৭. বাস্তব পর্যবেক্ষণ, জানুয়ারী, ২০০১

৯৮. Abu Musa, *op.cit,* p. 19

৯৯. *Ibid,* p, 17

১০০. মসজিদের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১০১. Abu Musa, *op.cit,* p. 31

১০২. মসজিদের বারান্দার পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১০৩. আ.ক.ম. যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৮

১০৪. মসজিদের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১০৫. মসজিদের বারান্দার পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১০৬. রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা, ১৯৮৭,পৃ.১৬

১০৭. *ঐ*, পৃ. ২২

১০৮. আ.ক.ম. যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০

১০৯. সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৫৫৪

Dhaka University Institutional Repository

১১০. Abu Musa, *op.cit,* p. 22

১১১. *Ibid*

১১২. আরশা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১০

১১৩. *ঐ*,

১১৪. মুন্সিগঞ্জ জেলার বেশ কয়েকটি মঠ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই মঠগুলো টংগীবাড়ী মঠ, তেঘড়িয়া মঠ, দাহির পাড়া মঠ, কনকসার শিব মন্দির ও কামাকসার মঠ। এই মঠগুলোর বিবরণ প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রতিবেদনে আছে। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের সময় এই মন্দির ও মঠগুলো ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে।

১১৫. Abu Musa, *op.cit,* p. 25

১১৬. প্রবেশ পথের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১১৭. Abu Musa, *op.cit,* p. 17

১১৮. *Ibid*

১১৯. *Ibid*

১২০. আ.ক.ম. যাকারিয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮৮

১২১. মঠের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১২২. Abu Musa, *op.cit,* p. 26

১২৩. বাস্তব পর্যবেক্ষণ, জানুয়ারী, ২০০১

১২৪. Abu Musa, *op.cit,* p. 26

১২৫. *op.cit,* p. 34

১২৬. *Ibid*

১২৭. সাক্ষাৎকার গ্রহণ, জানুয়ারী, ২০০১

১২৮. Abu Musa, *op.cit,* p. 34

Dhaka University Institutional Repository

১২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪

১৩০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২১

১৩১. মঠের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৩২. Abu Musa, *op.cit,* 21

১৩৩. *Ibid*

১৩৪. *Ibid*

১৩৫. শিব মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৩৬. Abu Musa, *op.cit,* 21

১৩৭. এই বারান্দার পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৩৮. Abu Musa, *op.cit,* p. 33

১৩৯. শ্যামসিদ্ধির মঠের বহির্ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৪০. Abu Musa, *op.cit,* p. 34

১৪১. *op.cit,* p. 27

১৪২. *Ibid*

১৪৩. *Ibid,* p. 14

১৪৪. গৃহের উচ্চতার মাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৪৫. এই গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ সুরেশ চন্দ্রের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

১৪৬. Abu Musa, *op.cit,* p. 32

১৪৭. মঠের ভিতের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৪৮. Abu Musa, *op.cit,* p. 32

১৪৯. মঠের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৫০. ঐ,

১৫১. Abu Musa, *op.cit,* p. 13

Dhaka University Institutional Repository

১৫২. *Ibid*

১৫৩. *Ibid*

১৫৪. ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ

১৫৫. মঠের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৫৬. Abu Musa, *op.cit,* p. 30

১৫৭. *Ibid*

১৫৮. মঠের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৫৯. মঠের অভ্যন্তরের কুলঙ্গির পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৬০. মঠের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৬১. আয়শা বেগম, 'মুগল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইদ্রাকপুর জলদুর্গ' *নিবন্ধমালা*, অষ্টম খন্ড,উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ. ১২৬

১৬২. অব্দুল করিম, *বার ভূঞা পরিচিতি*, হবিবুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.৭

১৬৩. হায়াৎ মামুদ (সম্পা.), *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১৬

১৬৪. Aysha Begum, *Medieval Forts in Bengal: An Architectural Study,* Ph. D. Thesis (Unpublished), Rajshahi, 1992, pp. ৪০৬-৪০৭

১৬৫. আয়শা বেগম, 'মুগল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইদ্রাকপুর জলদুর্গ' *নিবন্ধমালা*, অষ্টম খন্ড, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪, পৃ. ১২৮

১৬৬. *ঐ*, পৃ. ১২৯

১৬৭. *ঐ*, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

১৬৮. Abu Musa, *op.cit,* p. 8

১৬৯. প্রবেশ তোরণের পরিমাপ গবেষক কর্তৃক গৃহীত

১৭০. আয়শা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৯

১৭১. *ঐ*,

১৭২. *ঐ*,

১৭৩. *ঐ*,

১৭৪. *ঐ*, পৃ. ১৩০

১৭৫. *ঐ*,

১৭৬. নূরুল ইসলাম (সম্পা.), *ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১১০

১৭৭. *A Documented History of Archaeological Background of Eastern Pakistan Circle*, Dacca, Undated, p. 29

১৭৮. *List of Ancient Monuments in Bengal,* Calcutta, 1896, p. 206

১৭৯. বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘরের সংরক্ষিত ইমারতের তালিকা: ইদ্রাকপুর দুর্গ, ক্রমিক নম্বর ১৫৩, প্রজ্ঞাপন নং এফ ২৭০৯ ই তারিখ ১-১০-১৯০৯

১৮০. A. H. Dani, *Dacca: A Record of its Changing Fortunes*, Dacca, 1956, p. 259

১৮১. আয়শা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩

১৮২. Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka past present Future,* Dhaka, 1991, p. 313

১৮৩. Abu Musa, *op.cit,* pp. 10-11

১৮৪. হাবিবা খাতুন, 'নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রত্নসম্পদ: সেতু, *ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

তাম্রশাসন ও ভাস্কর্য্য

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন রাজবংশের তাম্রশাসন আবিস্কৃত হওয়ায় এই অঞ্চলের ইতিহাস পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে। চন্দ্র বংশের শাসনকর্তা শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিস্কৃত হওয়ায় বিক্রমপুর যে অনেক পূর্ব হতেই দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল তা জানা সম্ভব হয়েছে। পূর্বে বিক্রমপুরকে শুধু সেন আমলের রাজধানী বলা হতো। কিন্তু চন্দ্র ও বর্ম বংশের আবিস্কৃত তাম্রশাসন গুলোতে বিক্রমপুরকে রাজধানী বলা হয়েছে। অধিকন্তু বিক্রমপুরে প্রাপ্ত ভাস্কর্য্যগুলো ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব বংগের ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়তা করেছে এরূপ তাম্রশাসন ও ভাস্কর্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল।

তাম্রশাসন

রামপাল লিপি (শ্রীচন্দ্রদেব) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ১৪$^{১/২}$ সেন্টি মিটার x ২০সেন্টি মিটার

রাজার নামের উপর বৌদ্ধমতের চিহ্নস্বরূপ "ধর্ম-চক্র-মূদ্রা" এবং উভয়পার্শ্বে দুটি মৃগ মূর্তি খোদিত আছে। রাজার নামের নিচে অর্ধচন্দ্রচিহ্ন, তার উভয়পার্শ্বে এবং নিম্নে ফুল, লতা-পাতার নকশা। এই তাম্রশাসনটিতে মোট পঞ্চাশটি লিপি খোদিত আছে।

এ ভূমি দান লিপি সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ এবং বিক্রমপুর নগরী হতে প্রকাশিত ।

কেদারপুর লিপি (শ্রীচন্দ্রদেব) ঃ

এই তাম্রশাসনের আয়তন ২২সেন্টিমিটার x ১৮$^{১/২}$ সেন্টিমিটার।

এর উপরিভাগের মধ্যভাগে রাজকীয় মোহরাঙ্কিত আছে এবং এর উভয় পার্শ্বে দুটি শায়িত উন্নত শীর্ষ মৃগ ধর্ম চক্র বৌদ্ধ ধর্মমতের চিহ্নস্বরূপ উৎকীর্ণ আছে। এই চক্রের নিম্নভাগে চন্দ্রদেবের নাম প্রোথিত আছে। এ তাম্রশাসনটিতে মোট আঠারটি পংক্তি আছে। সাধারণত

Dhaka University Institutional Repository

তাম্রশাসন দ্বারা কোন দান সম্পাদিত হয় কিন্তু এ লিপি দ্বারা তা হয় নি। ইদিলপুর ও কেদারপুর লিপির একই মুসাবিদার প্রতিলিপি।

ইদিলপুর তাম্রশাসন (শ্রীচন্দ্রদেব) ঃ

এই তাম্রশাসনটির আয়তন জানা যায় নি।

এই তাম্রশাসনে মোট ছত্রিশটি পংক্তি আছে।

শ্রীচন্দ্রদেব কর্তৃক বিক্রমপুর ছাউনী হতে পদ্মাবতী ভূক্তির অধীন ভূমি দানের উল্লেখ আছে এতে। এ তাম্রশাসন হতে জানা যায় তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। উল্লেখ্য শ্রীচন্দ্রদেবের এই তিনটি তাম্রশাসনই বিক্রমপুর জয়স্কান্ধাবার হতে প্রকাশিত হয়েছে। একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশের শাসকরা রাজত্ব করেন।

বেলাব তাম্রশাসন (ভোজবর্মা) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ২৬$^{১/৪}$সেন্টিমিটার x ২৪সেন্টিমিটার। এতে মোট একান্নটি পংক্তি আছে এবং উপরিভাগের মধ্যভাগে রাজ মুদ্রায় বিষ্ণু চক্র মূদ্রিত ছিল। যাতে রাজার নাম প্রোথিত ছিল কিনা জানা যায়নি। উক্ত তাম্রশাসনটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত হয়েছে। এ লিপিটি হতে স্পষ্ট হয় যে, একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববংগ স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই তাম্রশাসন হতে তৎকালীন বিক্রমপুরের রাজ্যসীমা সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায়। তখন সূবর্ণ গ্রামের বিশ মাইল উত্তরের এলাকা ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।

সামন্তসার তাম্রলিপি (হরিবর্মা) ঃ

বর্ম রাজা হরিবর্মদেবের একটি অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গেছে। এই তাম্রশাসনটির আয়তন বা তাম্রশাসনটিতে কতটি পংক্তি আছে তা জানা যায় নি। এই

Dhaka University Institutional Repository

তাম্রশাসনটি বিক্রমপুর হতে প্রকাশিত হয়েছে। হরিবর্মার এই তাম্রশাসন হতে জানা যায় তিনি পরম-বৈষ্ণব-পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

দেবপাড়া তাম্রশাসন (বিজয় সেন) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ৭৬ সেন্টিমিটার x ৫০সেন্টিমিটার ।

মোট ছত্রিশটি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে এতে। এই লিপি হতে জানা যায় বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।এটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যারাকপুর তাম্রশাসন (বিজয়সেন) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ৩১$^{১/২}$সেন্টিমিটার x ২৭$^{১/২}$ সেন্টিমিটার।

মোট পঞ্চাশটি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে এতে।

তাম্রশাসনের উপরিভাগে সদাশিব মূর্তি খোদিত আছে।

এটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত হয়েছে।

নৈহাটি তাম্রশাসন (বল্লালসেন) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ৩৪$^{১/২}$সেন্টিমিটার x ৩৮ সেন্টিমিটার । তাম্রশাসনটির শীর্ষভাগে সদাশিব মূর্তি খোদিত আছে এবং এতে মোট ৬৪ টি পংক্তি আছে।

তাম্রশাসনের শুরুতে ওঁ ওঁ নম শিবায় উৎকীর্ণ আছে।

বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে তাম্রশাসনটি প্রকাশিত হয়েছে।

তরপন দীঘি তাম্রশাসন (লক্ষণ সেন) ঃ

লক্ষণ সেন কর্তৃক প্রচারিত তাম্রশাসনগুলোর মধ্যে তরপন দীঘি তাম্রশাসন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এর আয়তন ৩৪$^{১/৪}$সেন্টিমিটার x ২৯ সেন্টিমিটার । তাম্রশাসনটির শীর্ষভাগে

Dhaka University Institutional Repository

সদাশিব মূর্তি প্রোথিত আছে। মোট ৫৬টি পংক্তি খোদিত আছে এতে। এটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত।

আনুলিয়া তাম্রশাসন (লক্ষ্ণ সেন) ঃ

এ তাম্রশাসনটির আয়তন ৩৪সেন্টিমিটার x ২৯$^{১/২}$সেন্টিমিটার । এতে মোট ৫৬টি পংক্তি আছে। তাম্রশাসনের উপরিভাগে দশভুজ সমন্বিত সদাশিব মূর্তি খোদিত আছে এবং এর শুরুতে "ওমঁ ওমঁ নারায়ণ" খোদিত আছে। এটি বিক্রমপুর হতে প্রকাশিত হয়েছে।

শক্তিপুর তাম্রশাসন (লক্ষ্ণ সেন) ঃ

তাম্রশাসনটিতে মোট ৫৮ টি পংক্তি খোদিত আছে।

তাম্রশাসনটির উভয় দিকেই লিপি খোদিত আছে এবং উপরিভাগে সেন আমলের সদাশিব মূর্তি সংযোজিত হয়েছে। পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, পরম বৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন রাজা লক্ষ্ণণসেন। এটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত।

গোবিন্দপুর তাম্রশাসন (লক্ষ্ণ সেন) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ৩৪সেন্টিমিটার x ৩২$^{১/২}$সেন্টিমিটার ।

উপরিভাগে দশভুজ সমন্বিত সদাশিব মূর্তি খোদিত আছে। তাম্রশাসনের শুরুতে "ওঁ নমো নারায়ণা" খোদিত। এতে মোট ৫৩ টি পংক্তি খোদিত আছে।

তাম্রলিপিটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত।

মদন পাড় তাম্রশাসন (বিশ্বরূপসেন) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ৩২$^{১/২}$ সেন্টিমিটার ।

শীর্ষভাগে সদাশিব মূর্তি খোদিত আছে এতে । মোট ৬০ টি পংক্তি খোদিত আছে উক্ত তাম্রশাসনে এতে পূর্ববংগের রাজধানী বিক্রমপুর হতে ভূমি দানের উল্লেখ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যপাড়া তাম্রশাসন (কেশব সেন) ঃ

তাম্রশাসনটির আয়তন ২৫ সেন্টিমিটার x ৩২$^{১/২}$ সেন্টিমিটার ।

মোট ৬০ টি পংক্তি উক্ত তাম্রশাসনটিতে উৎকীর্ণ আছে।

"ওঁ ওঁ নমো নারায়ণা" এতে শুরুতেই লিখিত আছে।

শীর্ষভাগে সদাশিব মূর্তি এবং ব্রজপঞ্জর পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর বিশ্বরূপ সেন খোদিত আছে। এটি বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হতে প্রকাশিত।

আদাবাড়ী তাম্রশাসন (দনুজমাধব দশরথদেব) ঃ

এ তাম্রশাসনটি বিক্রমপুরের আদাবাড়ী গ্রামে পওয়া গেছে।

তাম্রশাসনটির আয়তন ৩০ সেন্টিমিটার x ২২$^{১/২}$ সেন্টিমিটার ।

এবং এর উপরিভাগে চারহাত বিশিষ্ট যোগাসন "শঙ্খ-চক্র-গদা"-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্তি খোদিত আছে। মোট ৫৫টি পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। রাজধানী বিক্রমপুর হতে উক্ত তাম্রশাসনটি প্রদত্ত হয়েছে।

ভাস্কর্য

বৌদ্ধ মূর্তি

ধ্যানী বুদ্ধ (অক্ষোভ্য)

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৫"।

উপকরণ :কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭২.৩৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যানী বুদ্ধ (অমিতাভ)

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৩$^{৪/৬}$।

উপকরণ : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭১.২০৩।

ধ্যানী বুদ্ধ (অক্ষোভ্য)

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪$^{১/২''}$।

উপকরণ : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ১১৬।

ধ্যানী বুদ্ধ (অক্ষোভ্য)

সময়কাল : একাদশ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উপকরণ : কালো পাথর ।

আয়তন : ৪১$^{১/২''}$

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ১১১৭।

ধ্যানী বুদ্ধ (অমিতাভ)

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উপকরণ : কালোপাথর।

Dhaka University Institutional Repository

আয়তন : ৩৬´´।

প্রাপ্তিস্থান : মহাখালী, মুন্সিগঞ্জ।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৪৩

ধ্যানী বুদ্ধ

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উপকরণ : কালো পাথর।

উচ্চতা : ৩´-২´´

প্রাপ্তিস্থান : মহাখালী, মুন্সিগঞ্জ।

বাবু দীন নাথ সেনের বাড়িতে রক্ষিত ছিল। বর্তমানে কোথায় সংরক্ষিত আছে জানা যায় নি।

বৌদ্ধ নিবেদন স্তূপ

সময়কাল : ৯ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪$^{১/৪}$´´।

উপকরণ : বেলে পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৮.৭৬।

বোধিসত্ত্ব (অবলোকিতেশ্বর)

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪$^{১/২}$´´।

উপকরণ : ব্রোঞ্জ

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭১.২১৪

Dhaka University Institutional Repository

বোধিসত্ত্ব লোকনাথ

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৬$^{১/২}$"।

উপকরণ : কালোপাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

দাতা : গোলাম মোস্তফা।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৮.৬৬।

জম্ভল (বৌদ্ধ ধন দেবতা)

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ২$^{৩/৪}$"।

উপকরণ : ব্রোঞ্জ

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭১.২১১।

বিষ্ণু (উপবিষ্ট)

সময়কাল : ১১ শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ২$^{৩/৪}$"।

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭১.১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

বিষ্ণু (হিন্দু ধর্মীয় রক্ষা দেবতা)

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : $৪^{৩/৪''}$।

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭১.৭।

বিষ্ণু

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : $৫^{১/২''}$।

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭৯.১০৬৭।

বিষ্ণু (নারায়ণরূপী)

সময়কাল : দ্বাদশ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৯''।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : মহাখালী, বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৯.১৭০।

বিষ্ণু (বামন অবতার)

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : $৩২^{১/২''}$।

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : জোড় দেউল, বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৬.৭।

বিষ্ণু (বাংলাদেশের বৃহত্তম ভাস্কর্য)

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৮২$^{১/২}$"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : আউটশাহী , মুন্সিগঞ্জ।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৭.৪০১।

বিষ্ণু

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৭"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : মুন্সিগঞ্জ।

দাতা : কালীপদ দত্ত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৬.৩৭।

বিষ্ণু

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৬৯ সেন্টি মিটার।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : জোড়া দেউল, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

দাতা : বর্তমান ভূমিমন্ত্রি এম শামসুল ইসলাম।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৯২.২০২।

বিষ্ণু (নরসিংহ অবতার)

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৩০"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৬.৩০।

বিষ্ণু (বরাহ অবতার)

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৭"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৮.৬৯।

বিষ্ণু (মৎস্য অবতার)

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৪"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর।

Dhaka University Institutional Repository

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৮.৭০।

বিষ্ণুপট্ট

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : $৫^{৩/৮''} \times ৫^{৩/৮'}$।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : মুন্সিগঞ্জ।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭০.১৩৬৩।

নটরাজ শিব

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : $২'৯'' \times ২'১'$।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : রামপাল, মুন্সিগঞ্জ।

দাতা : জগদীশ কুমার মজুমদার।

বর্তমানে কোথায় আছে তা জানা যায় নি।

সূর্য

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৬০''।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : রামপাল, বিক্রমপুর।

Dhaka University Institutional Repository

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭০.৩৮।

সূর্য

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৮″।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

দাতা : আব্দুস সোবহান।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৮.৬৫।

সূর্য

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৮″।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : মুন্সিগঞ্জ।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৫৯।

সদাশিব মূর্তি

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৩১/৮″।

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭৮.৪১৪।

অঘোর

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৩৬$^{১/২''}$।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : রামপাল, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৩৪।

কল্যাণসুন্দর

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ২৬$^{১/২''}$।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : শঙ্করবান্ধা, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৩৫।

তারা

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উপকরণ : পিতল।

উচ্চতা : ৩$''$।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭১.২৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

তারা

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উপকরণ : ব্রোঞ্জ।

উচ্চতা : ৩$^{১/৪''}$।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৮.৭৫।

ভৃকুটি তারা

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উপকরণ : বেলেপাথর।

উচ্চতা : ৪৮''।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

দাতা : কালীপদ দত্ত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৬.৪০।

মহাপ্রতিসরা (বৌদ্ধ দেবী)

সময়কাল : একাদশ শতাব্দী (আনুমানিক)।

আয়তন : ২$^{১/২''}$ x ২''

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে কোথায় আছে তা জানা যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

মহাপ্রতিসরা (বৌদ্ধ দেবী)

সময়কাল : ত্রয়োদশ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৩$^{৩/৪}$"।

উপাদান : পিতল।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৯৬।

মহাপ্রতিসরা (বৌদ্ধ দেবী)

সময়কাল : দ্বাদশ শতাব্দী (আনুমানিক)।

আয়তন : ৩$^{১/২}$"।

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৯৬।

মহাপ্রতিসরা (বৌদ্ধ দেবী)

সময়কাল : দশম শতাব্দী (আনুমানিক)।

আয়তন : ৩৫"।

উপাদান : কালোপাথর।

প্রাপ্তিস্থান : মুন্সিগঞ্জ।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৯.১৭০।

মহিষমর্দিনী

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪$^{৩/৪}$"।

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বজ্রযোগিনী, মুন্সিগঞ্জ।

দাতা : ডালিম কুমার গুহ।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ১২১।

উমা- মহেশ্বর

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৫″।

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : রঘুরামপুর, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ১২২।

উমা- মহেশ্বর

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ২৮″।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : জোড়াদেউল, বিক্রমপুর।

দাতা : সফিউল হক ভূঁইয়া।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৭.২৩৩।

রেবন্ত

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৮$^{১/৪}$″।

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর।

দাতা : ডালিম কুমার

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ১৭৪.২৯।

পর্ণশবরী

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৫১″।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৮.৬৭।

শ্যামাতারা

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৮″।

উপাদান : বেলে পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : সুখবাসপুর, বিক্রমপুর।

দাতা : বাবু রায় রমেশ চন্দ্র গুহ।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ২১।

শ্যামাতারা

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪৮″।

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : সোমপাড়া, বিক্রমপুর।

দাতা : আশুতোষ গুহ।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ১৫।

হারীতী (বৌদ্ধ দেবী)

সময়কাল : ১২শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ১৭$^{১/২}$"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : পাইকপাড়া, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৫২।

স্বরস্বতী (হিন্দু বিদ্যা দেবী)

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ২০"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বজ্রযোগিনী, মুন্সিগঞ্জ।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৫০।

গৌরী

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৬৩$^{১/২}$"।

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : পাইকপাড়া, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৬.৩।

গৌরী

সময়কাল : দ্বাদশ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৮১/৪″।

উপাদান : ব্রোঞ্জ।

প্রাপ্তিস্থান : সোনারং, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭২.৫৬৪।

মহামায়া

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৫৬″।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : কাগজীপাড়া, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৯.১৭।

চামুন্ডা

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ২৯১/২″।

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : রামপাল, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৩৩।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি

সময়কাল : দ্বাদশ শতাব্দী (আনুমানিক)।

আয়তন : অজ্ঞাত।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : পুরাপাড়া দেউল, বিক্রমপুর।

দাতা : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

গজলক্ষী

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪০$^{১/২}$"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : জোড়া দেউল, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৬.৫।

চন্ডী

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৪২"।

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান : বেলে পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : বজ্রযোগিনী, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ১১২৩।

ত্রিবিক্রম বামুন

সময়কাল : ১০ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ৩৮$^{১/২}$"।

উপাদান : কালো পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : জোড়া দেউল, বিক্রমপুর।

দাতা : অজ্ঞাত।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৬৬.৬।

স্তম্ভ

সময়কাল : ১১শ শতাব্দী (আনুমানিক)।

উচ্চতা : ১২´৬"

উপাদান : কাঠ।

প্রাপ্তিস্থান : উত্তর কাজী কসবা, বিক্রমপুর।

বর্তমানে জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে আছে। সংগ্রহ নম্বর - ৭৫.২৯৫

কাঠের ফলক

সময়কাল : ৯ম শতাব্দী (আনুমানিক)।

আয়তন : ৪´৪" x ১´৩" x ১´৫"।

উপাদান : কাঠ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্তিস্থান : সোনারং দেউল, বিক্রমপুর।

দাতা : বাবু রত্নেশ্বর।

বর্তমানে কোথায় আছে জানা যায় নি।

পাথর স্তম্ভ

সময়কাল : অজ্ঞাত।

আয়তন : ৪´´ x ১৩´´ x ১´´।

উপাদান : কাঠ।

প্রাপ্তিস্থান : সোনারং দেউল, বিক্রমপুর।

দাতা : বাবু রত্নেশ্বরসেন।

পাথরের চৌকাঠ

সময়কাল : অজ্ঞাত।

আয়তন : ৬´´ x ১৯´´ x ১২´´।

উপাদান : বেলে পাথর।

প্রাপ্তিস্থান : সোনারং দেউল, বিক্রমপুর।

দাতা : রত্নেশ্বর সেন।

বর্তমানে কোথায় আছে তা জানা যায় নি।

উপরোল্লিখিত তাম্রশাসন ও ভাস্কর্য্যগুলো থেকে প্রমাণিত হয় বিক্রমপুর দশম শতাব্দী হতে পূর্ববংগের রাজধানী ছিল। সেন শাসনের অবসানের পর বা সেন শাসনের শেষের দিকে বিক্রমপুরে দেববংশ নামে একটি নতুন রাজবংশের আবির্ভাব ঘটেছিল। দশরথদেব প্রথমে বিক্রমপুর হতেই তার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন আদাবাড়ি তাম্রশাসন তার প্রমাণ। পরবর্তীতে তিনি রাজধানী বিক্রমপুর হতে সোনারগাঁ স্থানান্তর করলে বিক্রমপুরের মর্যাদা হ্রাস পায়। এই তাম্রশাসন এবং ভাস্কর্য্যগুলো বিভিন্ন রাজবংশের শাসন আমলে বিক্রমপুরের সীমা, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, অবস্থা জানতে সহায়তা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষা

আইল	স্তম্ভ সারি দ্বারা বিভক্ত মধ্যবর্তী লম্বালম্বি অংশ বা পথ। আইল সাধারণতঃ কিবলা দেয়ালের সমান্তরালে নির্মিত হয়।
আরকেড	স্তম্ভ বা দেয়ালের অংশ দ্বারা বহনকৃত নির্মিত খিলান সারি।
আরকুয়েট	নির্মাণ কার্য সম্পাদনের জন্য খিলানকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় এই পদ্ধতিতে।
কিউপোলা	ক্ষুদ্র গম্বুজ।
কুলঙ্গি	দেয়ালে অন্তঃপ্রবিষ্ট অবতল খোপ।
খিলান	কোন উন্মুক্ত স্থানকে পার্শ্ববর্তী দুটি স্তম্ভ বা দেয়ালের সাথে সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত স্থানের উপর বক্রাকার বা এইরূপ কোন আকারের স্থাপত্য কৌশল এমনভাবে নির্মিত হয় যে তার উপরস্থ চাপ কর্ণের রেখায় নিচের দেয়াল বা স্তম্ভের উপর পড়ে। সাধারণত দরজা ও জানালার উপর নির্মিত এইরূপ স্থাপত্য অঙ্গকে খিলান বলে।
খিলান, দ্বিকেন্দ্রিক	দুই বলয় বিশিষ্ট খিলান, দুই কেন্দ্র থেকে উত্থিত বৃত্তাংশের খিলান।
খিলান, চতুর্কেন্দ্রিক	চার বলয় বিশিষ্ট খিলান, চারটি কেন্দ্র থেকে উত্থিত বৃত্তাংশের খিলান।
গম্বুজ	কোন কক্ষ বা ইমারতের কাঠামোর উপর নির্মিত অর্ধাবৃত্তাকার বা এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট ছাদকে গম্বুজ বলে।
জুল্লাহ	কিবলার দিকে ছাদ বিশিষ্ট নামাজের স্থান।
টেরাকোটা	পোড়ামাটির ফলকে ফুল, লতা-পাতা দেবদেবী, নারী-পুরুষ, জীব-জন্তু জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি উৎকীর্ণ অলংকরণ।
পলকাটা	শিরা বিন্যাস, গোলাকার ফুলন।

Dhaka University Institutional Repository

পান্দান্তিভ	বর্গকার কাঠামোর উপর বৃত্তাকার গম্বুজ ধরে রাখার জন্য বর্গের কোণগুলোতে নির্মিত ত্রিভুজাকার স্থাপত্যিক সংগঠন।
প্যানেল	দেয়াল গাত্র বা দরজা গাত্রে আয়তাকার বর্গাকার অংশ বা বিভাজন বিশেষ। এগুলো সমতল, স্ফীত, কিছুটা অন্তপ্রবিষ্ট বা নকশাকৃত হতে পারে।
প্রদীপ কুলঙ্গি	প্রদীপ স্থাপনের জন্য দেয়ালে অন্ত:প্রবিষ্ট খোপ।
ফাসাদ	ইমারতের সম্মুখভাগ।
ফিনিয়াল	বুরুজ বা গম্বুজের ক্রমহ্রাসমান সূচালো শিরোচূড়া।
বুরুজ	টাওয়ার, মিনার, স্তম্ভ । স্বাধীনভাবে দন্ডায়মান ইমারত বা অন্য ইমারতের অংশ হতে পারে। ইমারতের কোণাকে মজবুত করার জন্য চারকোণে বৃত্তাকার, বর্গাকার বা অষ্টভুজাকার মোটা ও শক্তিশালী খুটিকে বুরুজ বলে।
বে	খিলান পথ, ছাদ অথবা মেঝের ভাগ।
ব্যাসাল্ট	কষ্টিপাথর।
মিনার	মসজিদ সংলগ্ন বা মসজিদের বাইরে নির্মিত উঁচু বুরুজ। এই বুরুজ হতে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান করা হয়।
মিম্বার	বক্তৃতা মঞ্চ, ইমাম যার উপর দাড়িয়ে খুৎবা পাঠ করেন।
মিহরাব	মসজিদের কিবলা দেয়ালে স্থাপিত বৃহৎ কুলঙ্গি।
মোটিফ	নকশার মূল বিষয়, কোন প্রধান উপাদান বা বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করে দেখানো।
রিওয়াক	কিবলা দিক ছাড়া অবশিষ্ট তিন দিকে কোঠা বিশিষ্ট আবেষ্টনী প্রাচীর।
সাহন	জুল্লার বিপরীত পার্শ্বের উন্মুক্ত চত্বর।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

English:

Ahmed, Nazimuddin.	*Discover the Monuments of Bangladesh*, Dhaka, UPL, 1984.
Ahmed, Shamsuddin.	*Inscriptions Of Bengal*, Vol-iv, Rajshahi, Verendra Research Museum, 1960.
Ahmed , Sharif. Uddin (ed.),	Dhaka Past Present Future, *Dhaka, The Asiatic Society of Bangladesh, 1991.*
Ali, Mohammad Mohar.	*History of the Muslims of Bengal* (1203-1757), Vol-1, Riyadh, Imam Muhammad IBN Sa'ud Islamic University, 1985.
Ali, Qazi Azhar.	*District Administration in Bangladesh*, Dacca, National Institute of public Administration, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

Asher Catherine. B	*Architecture of Mughal India,* London, Cambridge University Press, 1992.
Bagchi, K.	*The Ganges Delta.,* Calcutta, University press, 1914.
Batley, C.	*The Design Development of Indian Architecture,* London, Alec Tiranti Ltd, 1960.
Bernier, F.	*Travels in the Mughal Empire* 1656-1668 A.D. Revised by Archibold Constable, Westminister, 1891.
Bhattashali, N. K.	*Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal.*Cambridge, W. Heffer & Sons, 1922.

Dhaka University Institutional Repository

----------. *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum,* Dacca, Dacca Museum, 1929.

Blochmann, H. *Contributions to the Geography and History of Bengal,* Muhammedan period, Calcutta, Asiatic Society,1968.

Brown , Percy. *Indian Architecture (Buddhist and Hindu period),* Bombay, D. B. Taraporevala Sons & company Pvt. Ltd, 1949.

----------. *Indian Architecture(Islamic period),* Bombay, D.B. Taraporevala Sons & Company Pvt. Ltd, 1942.

Dhaka University Institutional Repository

Chatterji, S. P.	*Bengal In Maps,* Bombay, Orient Longmans, 1949.
Chakravarti, Dilip. Kumar.	*Ancient Bangladesh,* Dhaka, UPL, 1992.
Chowdhury, A. M.	*Dynastic History of Bengal,* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1967.
Creswell, K. A. C.	*A Short Account of Early Muslim Architecture,* London, Penguin Books, 1958.
----------.	Early Muslim Architecture *(EMA),* VoL-1, Pts, 1&11 Oxford, Clarendon Press, 1969.
Cunningham, Alexander.	*Archaeological Survey of India,* Report of Archaeological tour in Bihar & Bengal in 1874-80, vol -xv, Delhi, Indological book house, 1878.

Dhaka University Institutional Repository

Dani, A. H. *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961.

----------. *Dacca :A Record of its Changing Fortunes,* Dacca, Dacca Museum, 1962.

----------. *Bibliography of the Muslim inscriptions of Bengal* (down to1538 AD), Dacca , Asiatic Society of Pakistan, 1957.

Datta, Bimal Kumar. *Bengal Temples,* New Delhi, Munshiram Monoharlal publishers Pvt. Ltd, 1975.

Datta, Kalikinkar. *Studies in the History of the Bengal Subah* (1740-70, Social & Economic) Vol-1, Calcutta, University of Calcutta, 1936.

Dhaka University Institutional Repository

Dept. of Archaeology (GOB), — *Relevant Reports,* past and present.

Fazal, Abul. — Eng. tran. H. Beveridge, *Akbarnama,* 3 vols, Delhi, Indian Reprint, 1972-73.

Ferguson, J. — *History of Indian &Eastern Architecture,* New Delhi, Munshiram Manoharlal publishers Pvt. Ltd, 1972.

Habib, Irfan. — *An Atlas of the Mughal Empire, Centre of Advanced Study in History,* Delhi, Aligarh Muslim University, 1982.

Habibullah, A. B. M. — *The Foundation of Muslim Rule in India,* Allahabad, Central Book Depot, 1961.

Haque, Enamul. — *Islamic Art Heritage of Bangladesh,* Dhaka, BNM, 1983.

Dhaka University Institutional Repository

Haque, Saif Ul and Others (ed.), *Pundranagar to Sherebanglanagar, Architecture in Bangladesh*, Dhaka, Chetona Sthapatya Unnoyon Society, 1997.

Hasan, S. M. *A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan*, Dacca, Society for Pakistan Studies, 1970.

----------. *Mosque Architecture of pre Mughal Bengal*, Dacca, University press Ltd. 1979.

----------. *Muslim Monuments of Bangladesh*, Dhaka, Islamic Foundation, 1987.

Husain, A.B.M. (ed.), *Sonargaon-Panam*, Dhaka, Asiatic Society of Bengal, 1997.

Dhaka University Institutional Repository

----------, *Gaur-Lakhnauti,* Dhaka, Asiatic Society of Bengal, 1997.

Hunter,W.W. *Statistical Account of Bengal,* Vol-v, London, Trubness, Co, 1677.

Islam, Nurul (ed.), District Gazetteers Dacca, *Dacca, Bangladesh Government press, 1975.*

Islam, Sirajul (ed.), *History of Bangladesh,* (1704-1971), Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992.

Karim, A. *Social History of the Muslims in Bengal (down to 1538 A.D),* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1959.

----------. *History of Bengal (Sultani Period),* Dacca, Bangla Academy.1977.

Dhaka University Institutional Repository

----------. *History of Bengal (Mughal Period),* Vol-ll Rajshahi IBS,1995.

----------. *Corpus of the Arabic and Persian inscriptions of Bengal,* Dhaka, Asiatic Society of Bengal, 1992.

----------. *Murshid Kuli Khan and His Times,* Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1964.

Khan, M. Hafizullah. *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal,* Dhaka Asiatic Society of Bangladesh, 1988.

List of Ancient Monuments in Bengal, Calcutta, Public Workes Dept, Govt. of Bengal, 1896.

List of Protected Monuments and Mounds, Dhaka, Dept. of Archaeology, GOB, 1977.

Dhaka University Institutional Repository

Mc Cutchion, David J. — *Late Mediaeval Temples of Bengal, Origin & Classification,* Calcutta, The Asiatic Society of Bengal, 1972.

Michell, G. (ed.), — *Brick Temples of Bengal,* From the Archives of David Mcutch, New Jersy, Princeton University press, 1983.

Michell, G. (ed), — *The Islamic Heritage of Bengal,* Paris, Unesco, 1984.

Majumdar, N.G — *Inscriptions of Bengal,* Vol- iii, Rajshahi,Varendra Research Museum, 1929.

Majumdar, R.C (ed.), — *The History Of Bengal Vol-1, Hindu Period,* Dacca, University of Dacca, 1963.

Dhaka University Institutional Repository

Majumdar, S.C. *Rivers of the Bengal Delta,* Calcutta University Press, 1942.

Martin, M. *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* vol-lll, Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Mukharji, R. K. *The Changing Face of Bengal,* Calcutta, University of Calcutta, 1938.

Musa, Md, Abu. *Archaeological Survey Report Munshiganj, District*, Dacca, Dept. of Archaeology, 2000.

Nath, R. *History of Sultanate Architecture*, New Delhi, Abhinav Publications, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

Qureshi, I. H. *The Administration of the Sultanate of Delhi,* New Delhi, Oriental Books Corporations, 1971.

Rahim, A. *Social Cultural History of Bengal,* Voll-l & ll, vol-I Karachi, 1963.Vol-ll Karachi, Pakistan Publishing House, 1967.

Rashid, H. *Geography of Bangladesh,* Dacca, University press Ltd, 1977.

Rannell, James. *A Bengal Atlas,* London, Oxford University Press, 1780.

Sarkar , J. N (ed.), *The History of Bengal,* Voll-11, Muslim period, Dacca, The University of Dacca, 1972.

Sarkar , Jagadish. Narayan. *Islam in Bengal (13th to 19th century),*Calcutta, Ratna prakashan, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

Salim, Allah. Eng. Tran. F. Gladwin, *Tawarikh- I Banglah*, Calcutta, The Asiatic Society, 1788.

Saraswati, S. K. *Architecture of Bengal*, Book 1, Calcutta, G. Bharadhaj & Co. 1976.

Satish, Grover. *Architecture of India, 727-1707 A.D.* New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 1981.

Stewart, Charles. *The History of Bengal*, Delhi, Oriental Publishers, 1971.

Sur, A. K. *History and Culture of Bengal*, Calcutta, Chakravarti Chatterji and Co. Ltd, 1963.

Tarafdar, M. R. *Husain Shahi Bengal*, Dacca, University of Dhaka, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

Zahiruddin, Shah Alam & Others. *Contemporary Architecture Bangladesh*, Dhaka, Institute of Architects, Bangladesh, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আলী, আবিদ *গৌড় পান্ডুয়ার স্মৃতিকথা*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আলী, এ. কে. এম. ইয়াকুব *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

আহমদ, ওয়াকিল (সম্পা.), *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ রজত জয়ন্তী*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯৩।

আহমদ, খাজা নিযাম উদ্দীন *তবাকাত-ই-আকবরী*, ১ম খন্ড, আহমদ ফজলুর রহমান (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮।

আহমদ, সালাউদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পা.), *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ , ১৯৯১।

আহমেদ, নাজিমউদ্দিন *পূর্ব পাকিস্তানের স্থাপত্য*, ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, (১ম খন্ড- ১০খন্ড) ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

----------, *বাংলাদেশের ইতিহাস(১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, এস. এম. রফিকুল — *প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস(সেনযুগ)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০১।

করিম, আবদুল — *বাংলার ইতিহাস, (সুলতানী আমল)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

---------- — *বাংলার ইতিহাস,(মোগল আমল)*, ১ম খন্ড রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

---------- — *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

করিম, রেজাউল ও আজগর সৈকত (সম্পা.), — *সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান*। ঢাকা, রহমান গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রীজ, ১৯৯৩।

গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ — *বিক্রমপুরের ইতিহাস* (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স প্রকাশনী, ১৩১৬। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, রতনলাল — *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

চৌধুরী, আবদুল মমিন ও আলম ফখরুল (সম্পা.), — *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে নগর*, ঢাকা, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

তরফদার, এম. আর — *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস — *বাঙালার ইতিহাস*, ১ম ও ২য় খন্ড, কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

বারানী, জিয়াউদ্দিন — *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

বেগম, আয়শা — *আমাদের ঐতিহ্য শাহজাদপুর মসজিদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯০।

----------, — *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২।

বেগম, আয়শা (সম্পা.), — *টাঙ্গাইলের স্থাপত্যিক ঐতিহ্য*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০০।

ভট্টাশালী , নলিনীকান্ত — *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, ঢাকা, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল ষ্টাডিজ, ১৯৯৯।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র — *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খন্ড(প্রচীন যুগ), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৮।

মাহমুদুল হাসান, সৈয়দ — *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা, বাংলা একডেমী, ১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, সুখময় — *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব* (১২০৪-১৩৩৮),কলিকাতা, বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

মোহসীন, কে.এম ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ (১ম খন্ড)*, ঢাকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

যাকারিয়া, আ. কা. মো. *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।

রহিম, আবদুর ও অন্যান্য *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৯।

রহিম, আবদুর *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১মখন্ড)*,ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

রায়, নীহাররঞ্জন *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, কোলকাতা, লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৫৩।

রায়, যতীন্দ্রমোহন *ঢাকার ইতিহাস*, (১ম ও ২য় খন্ড), শৈব্যা প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০।

শর্মা, হিমাংশু মোহন *বিক্রমপুর(১ম খন্ড)*, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর প্রতিভা কার্যালয়, ১৩৩৮।

শেরওয়ানী, আব্বাস খান *তারিখ-ই-শেরশাহী*, মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (অনূদিত), ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬।

শাহনেওয়াজ, এ. কে.এম *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

সলীম, গোলাম হোসাইন *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, আকবর উদ্দীন (অনূদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

সাত্তার, আব্দুস *বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর পানি সংকট*, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজ, মিনহাজ উদ্দীন — *তবকাত-ই-নাসিরী*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূদিত ও সম্পা.), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

হোসেন, এ বি এম. — *আরব স্থাপত্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী

Banerji, R. D. `Naihati Copper Plate', *Epigraphia Indica* ,Vol- xlv, Calcutta, 1917- 18.

---------. `Barackpur Copper Plate,' *Epigraphia Indica* ,Vol- xv, Calcutta, 1921.

Chakravarti, M. M. `Bengal Temples and their Genaral Characteristics', *JPAHB*, N.S. Vol- v, Calcutta, 1906.

---------. `Notes on the Geography of Old Bengal', *JPASB,* N.S. Vol- iv, Calcutta, 1908.

---------. `Pre-Mughal Mosques of Bengal', *JPASB*, N.S. Vol- vi, Calcutta, 1910.

Husain, A.B.M. `The Ornamentation of the Sultanat Architecture in Bengal', *AJBSA*,Vol-1, Dhaka, 1978.

Dhaka University Institutional Repository

Kielhorn, `Deopara Copper Plate', *Epigraphia Indica* ,Vol- 1, Calcutta, 1892.

Tarafdar, M.R. `Notes on Indo- Muslim Architecture', *JASP*, Vol- xI, Dacca, 1966.

বাংলা

খাতুন, হাবিবা 'মুহাম্মাদাবাদ, স্থান চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গ', ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চদশ-বিংশতি বর্ষ, ঢাকা, ১৩৮৮ - ১৩৯৩।

--------, 'সোনারগাঁও রাজধানী শহর ও বন্দর', ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, একবিংশ বর্ষ প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৯৪

---------, 'নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রত্নসম্পদঃ সেতু', *ইতিহাস*, পরিষদ পত্রিকা, চৌত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০৭।

বেগম, আয়শা 'বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্য', *বাংলাদেশ ইতিহাস পারষদ রজতজয়ন্তী*, ইতিহাস পরিষদ ঢাকা, ১৯৯১।

----------, 'হাজিগঞ্জ দুর্গঃ নির্মাণকাল', *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, সপ্তবিংশতি বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ১৪০০।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র নং ঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

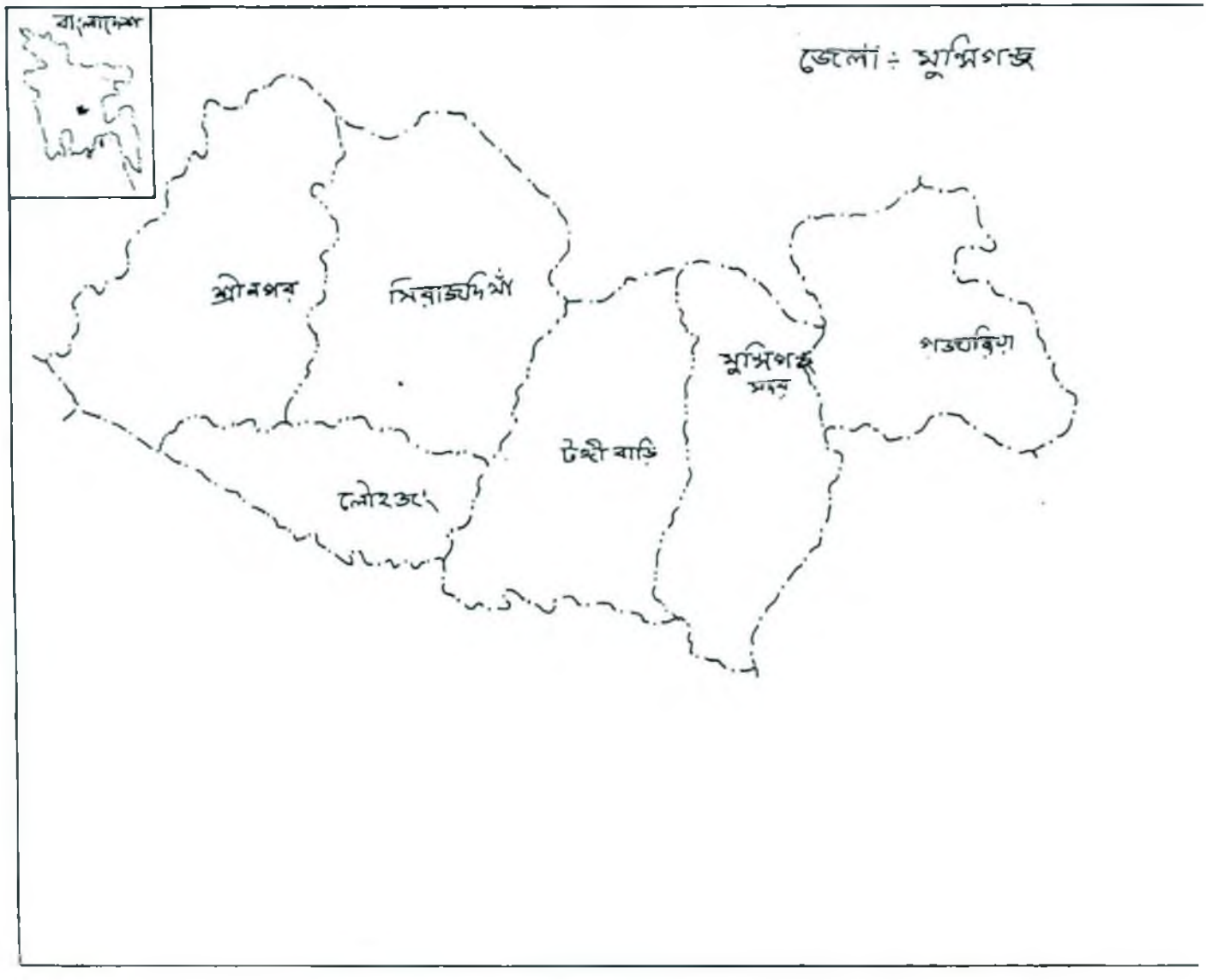

মানচিত্র-২

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-৩

Dhaka University Institutional Repository

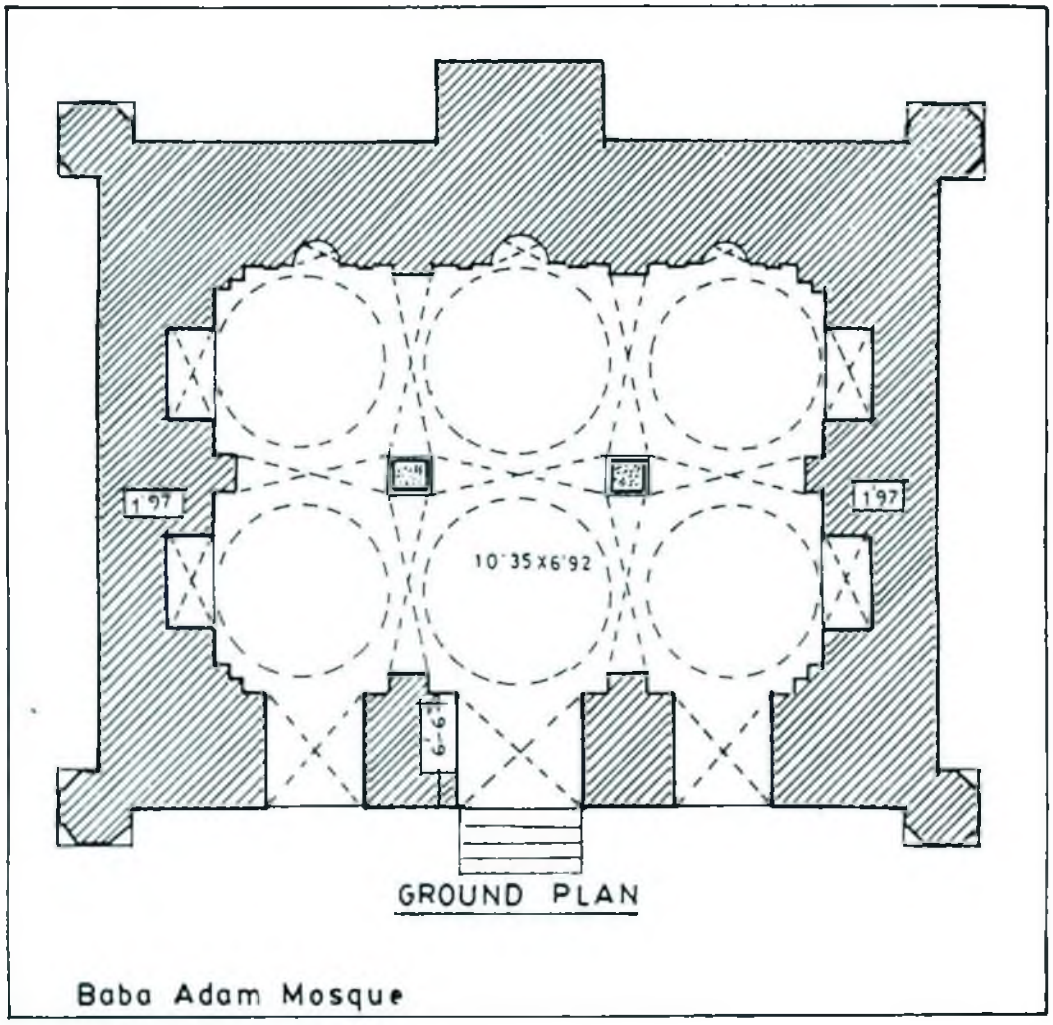

ভূমিনকশা : ১

Dhaka University Institutional Repository

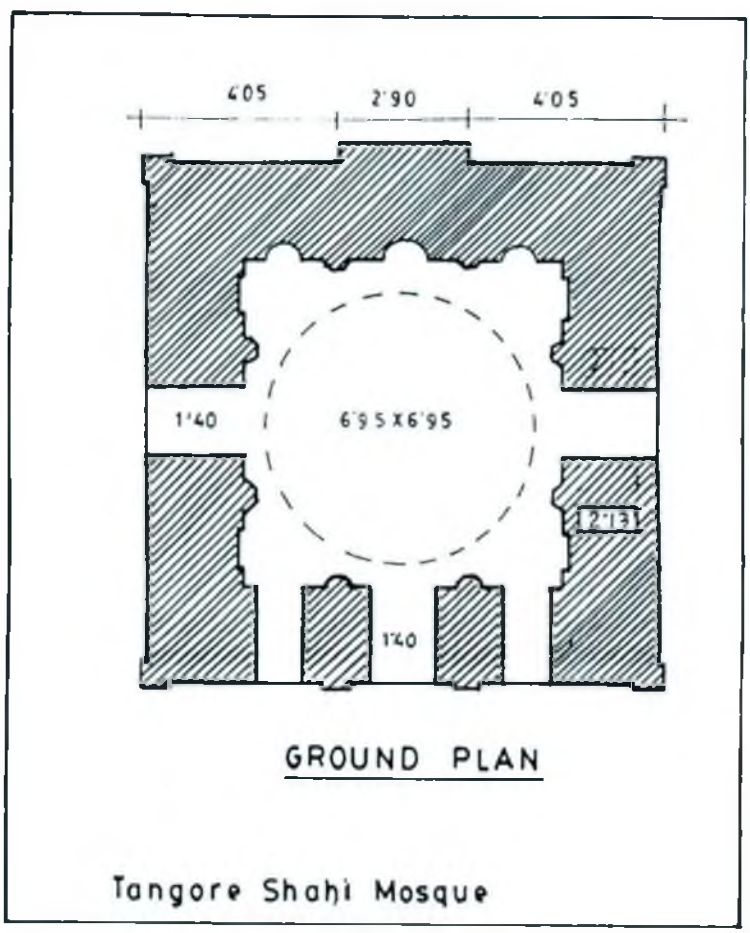

ভূমিনকশা : ২

Dhaka University Institutional Repository

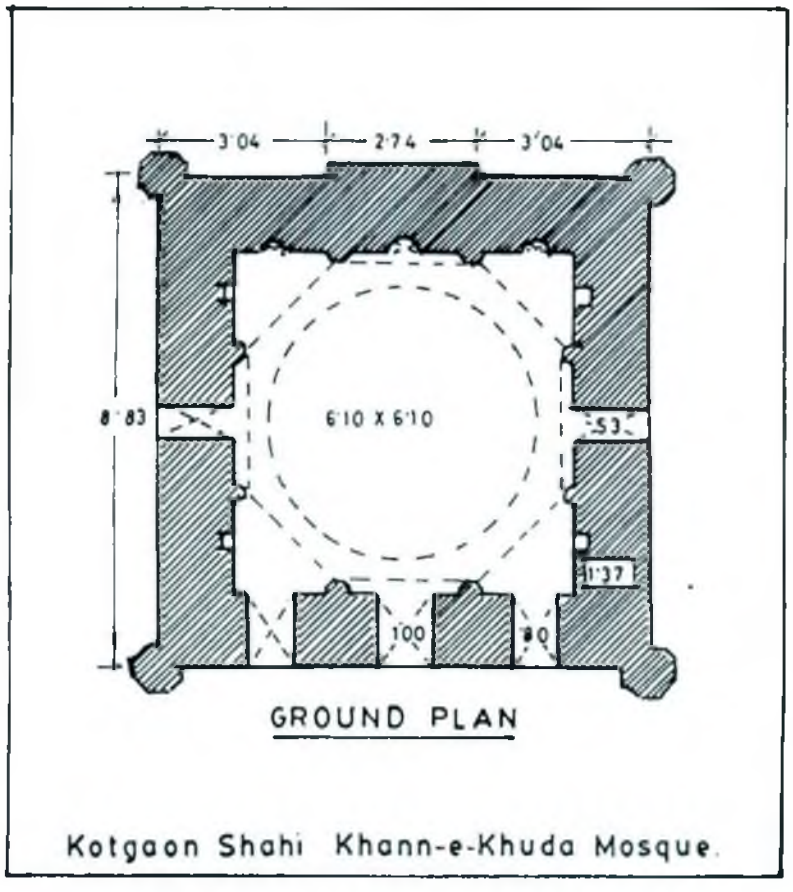

Kotgaon Shahi Khann-e-Khuda Mosque.

ভূমিনকশা : ৩

Dhaka University Institutional Repository

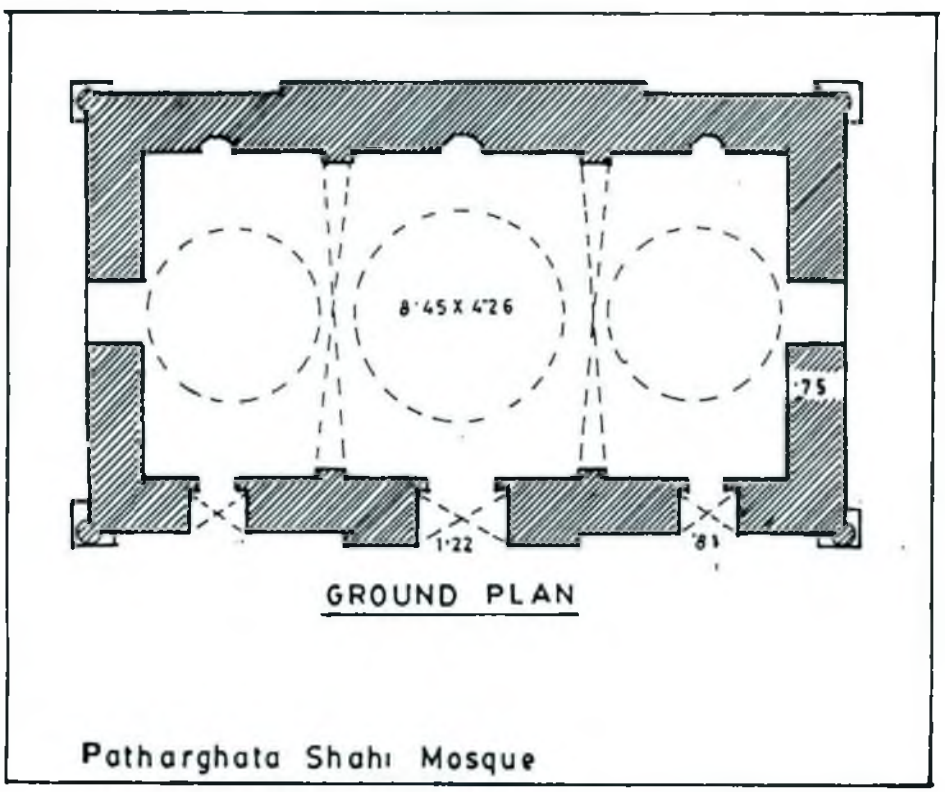

ভূমিনকশা : ৪

Dhaka University Institutional Repository

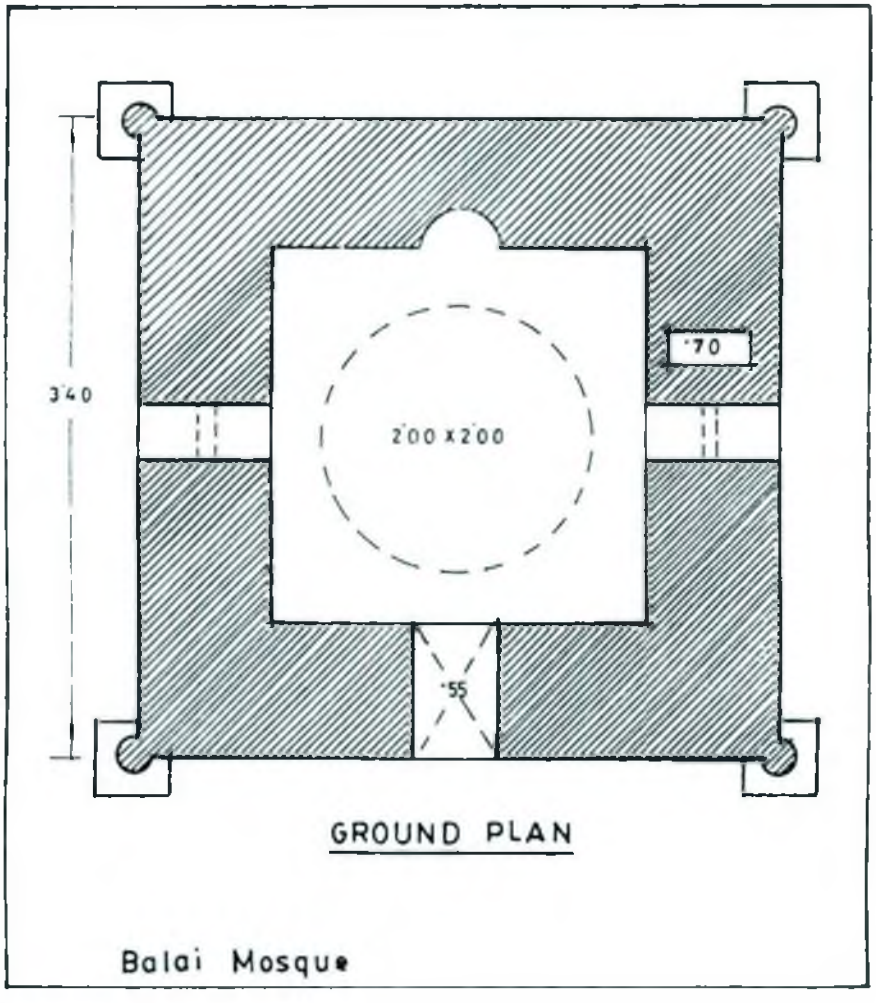

ভূমিনকশা : ৫

Dhaka University Institutional Repository

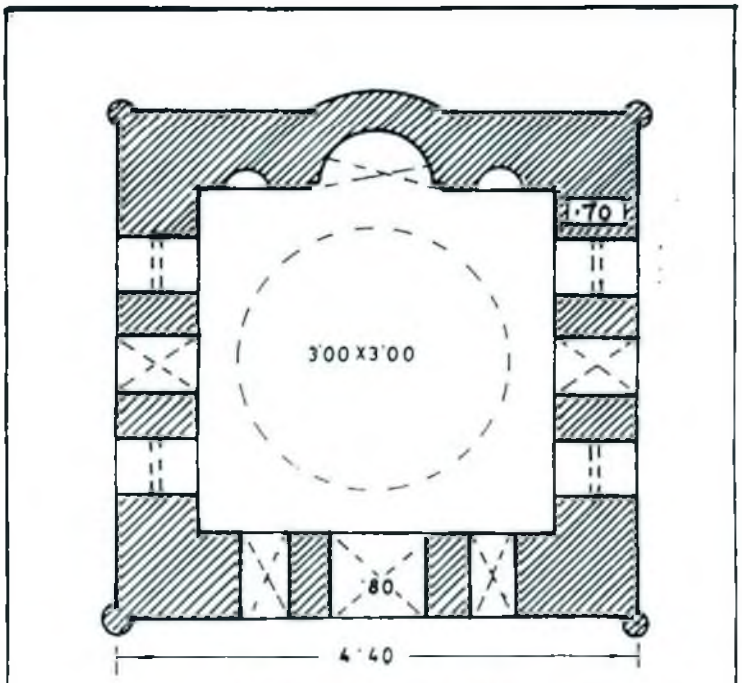

GROUND PLAN

Outshahi Mosque

ভূমিনকশা : ৬

Dhaka University Institutional Repository

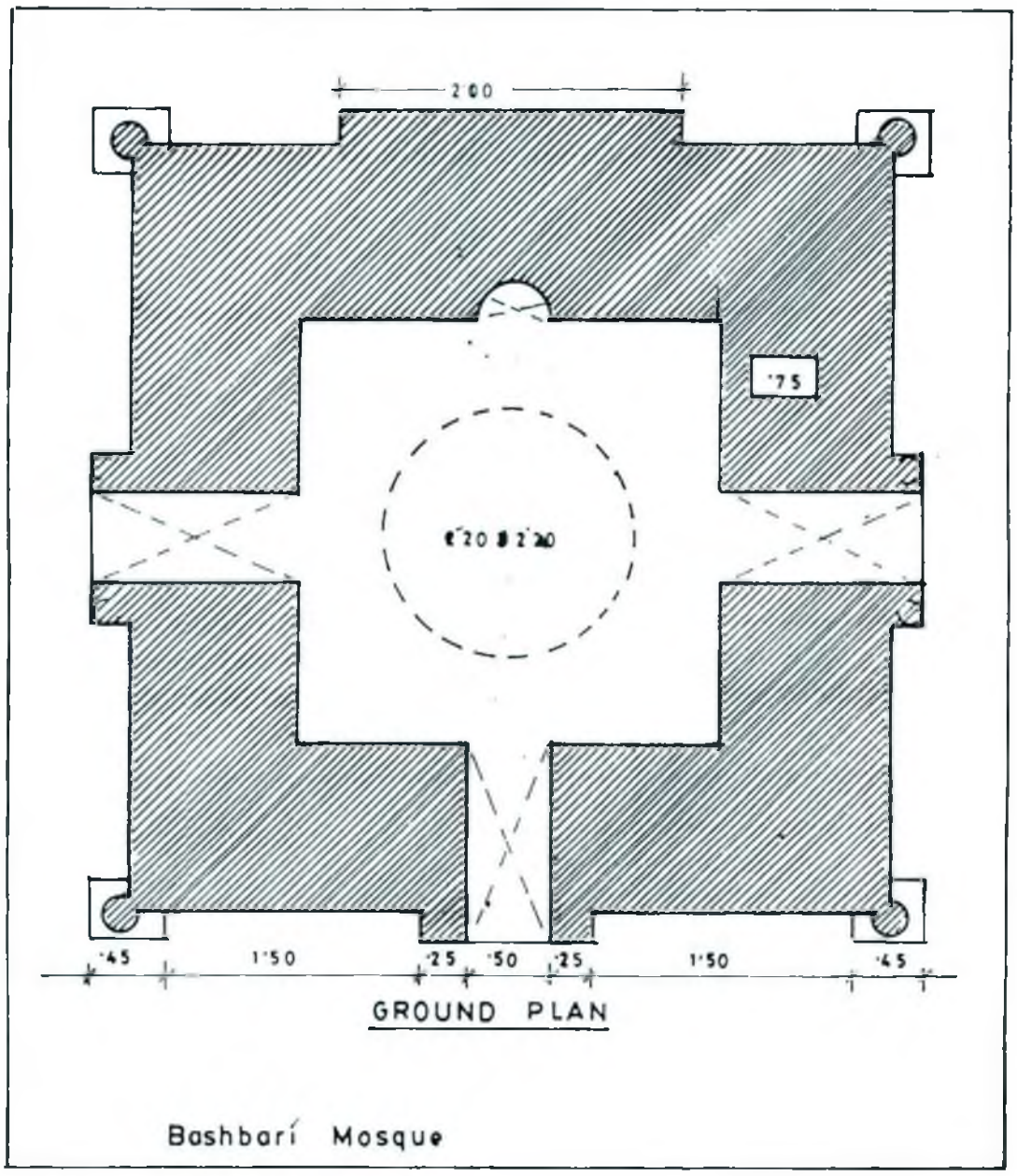

ভূমিনকশা : ৭

Dhaka University Institutional Repository

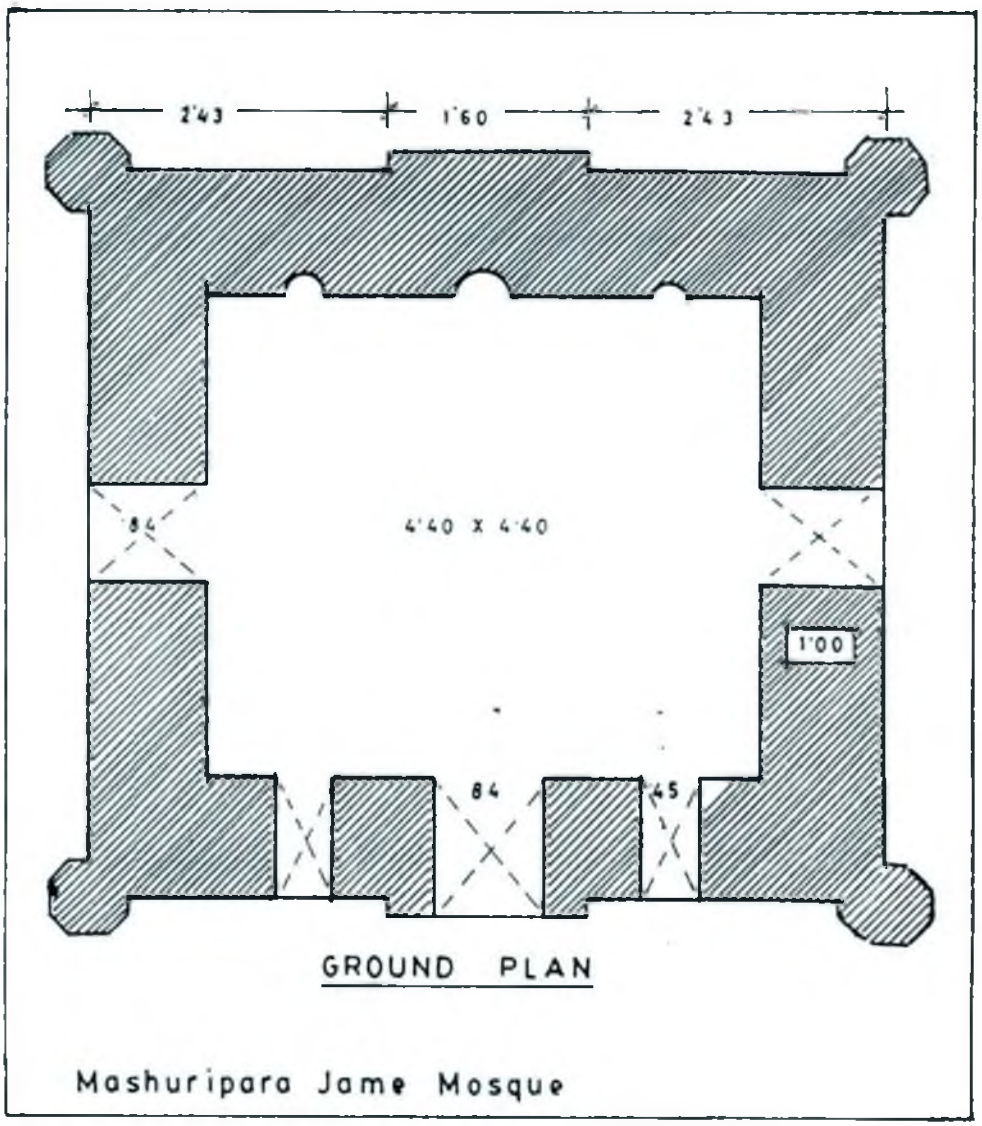

ভূমিনকশা : ৮

Dhaka University Institutional Repository

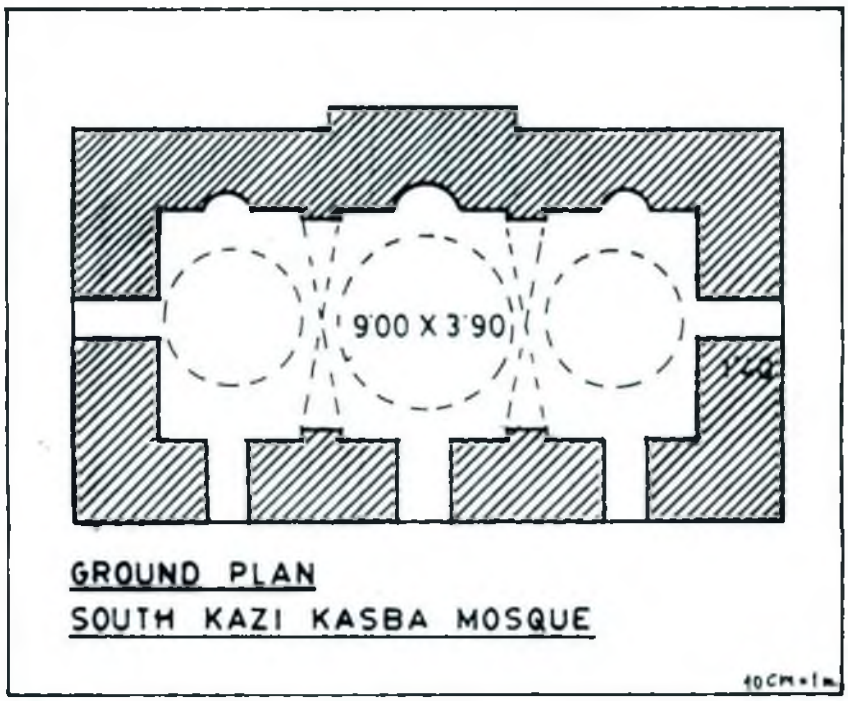

ভূমিনকশা : ৯

Dhaka University Institutional Repository

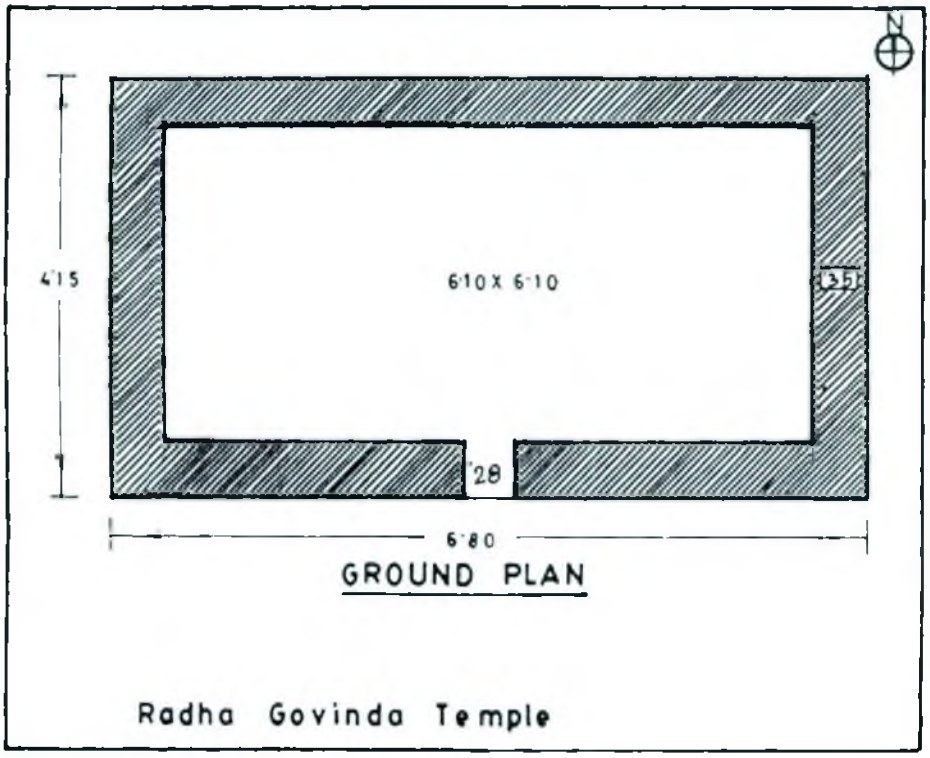

ভূমিনকশা : ১০

Dhaka University Institutional Repository

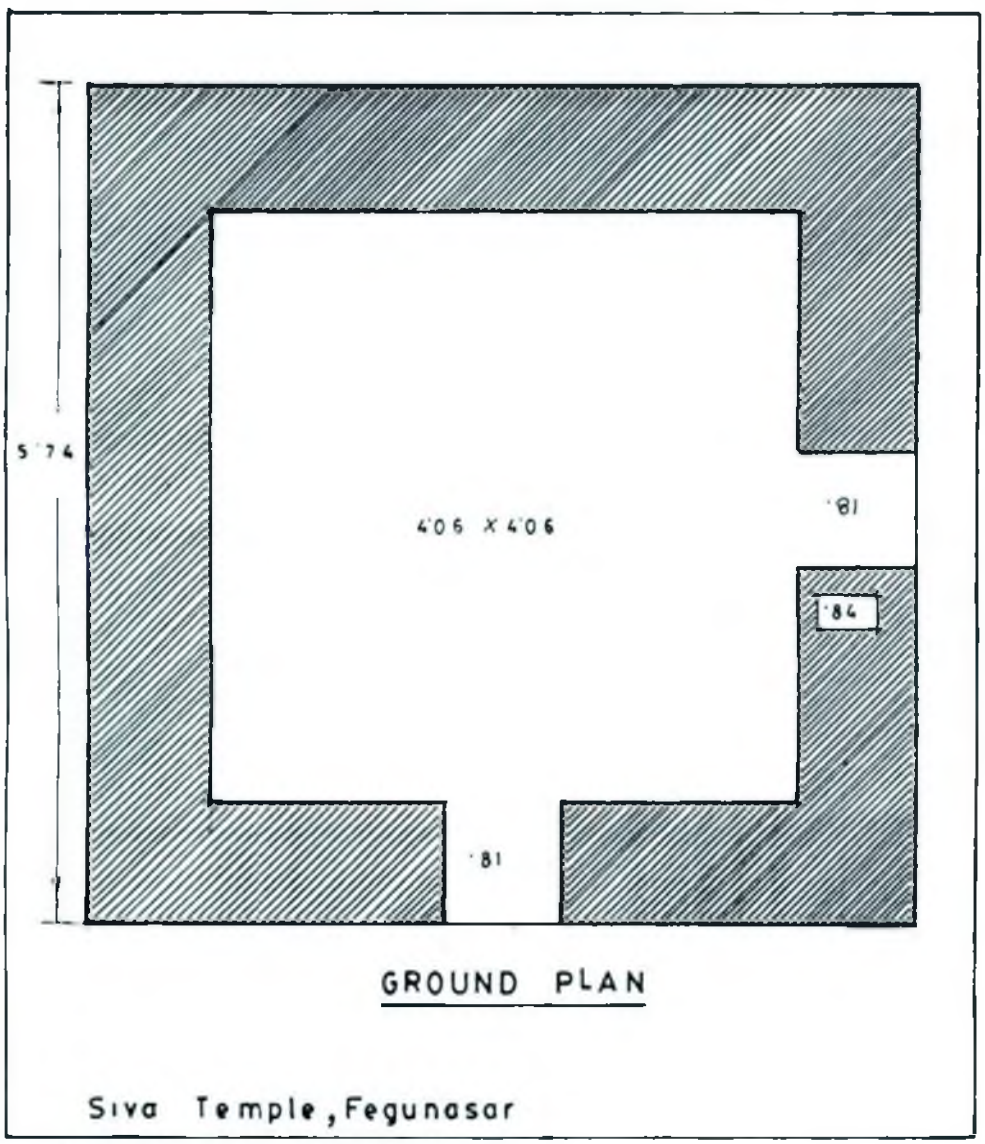

GROUND PLAN

Siva Temple, Fegunasar

ভূমিনকশা : ১১

Dhaka University Institutional Repository

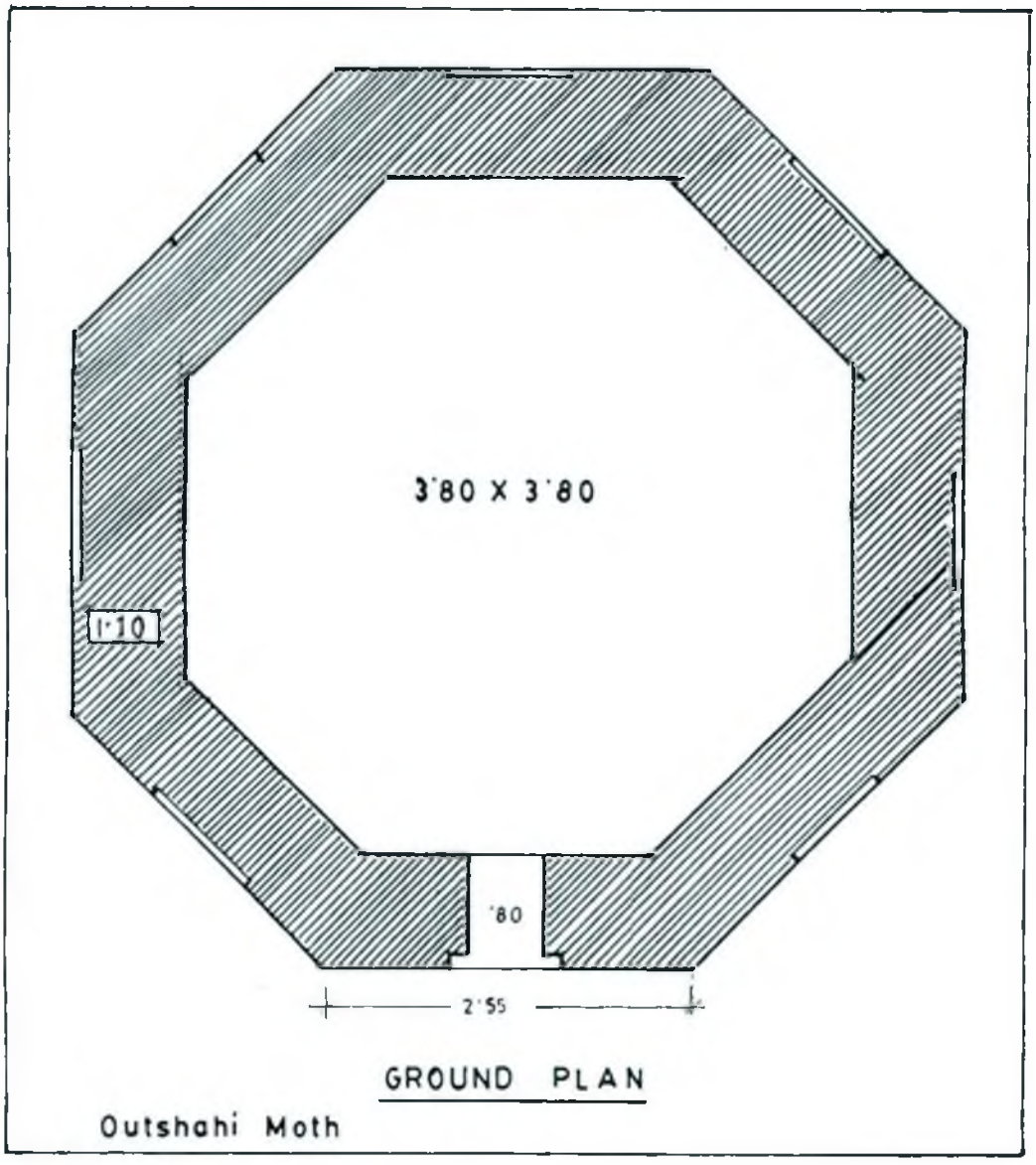

GROUND PLAN

Outshahi Moth

ভূমিনকশা : ১২

Dhaka University Institutional Repository

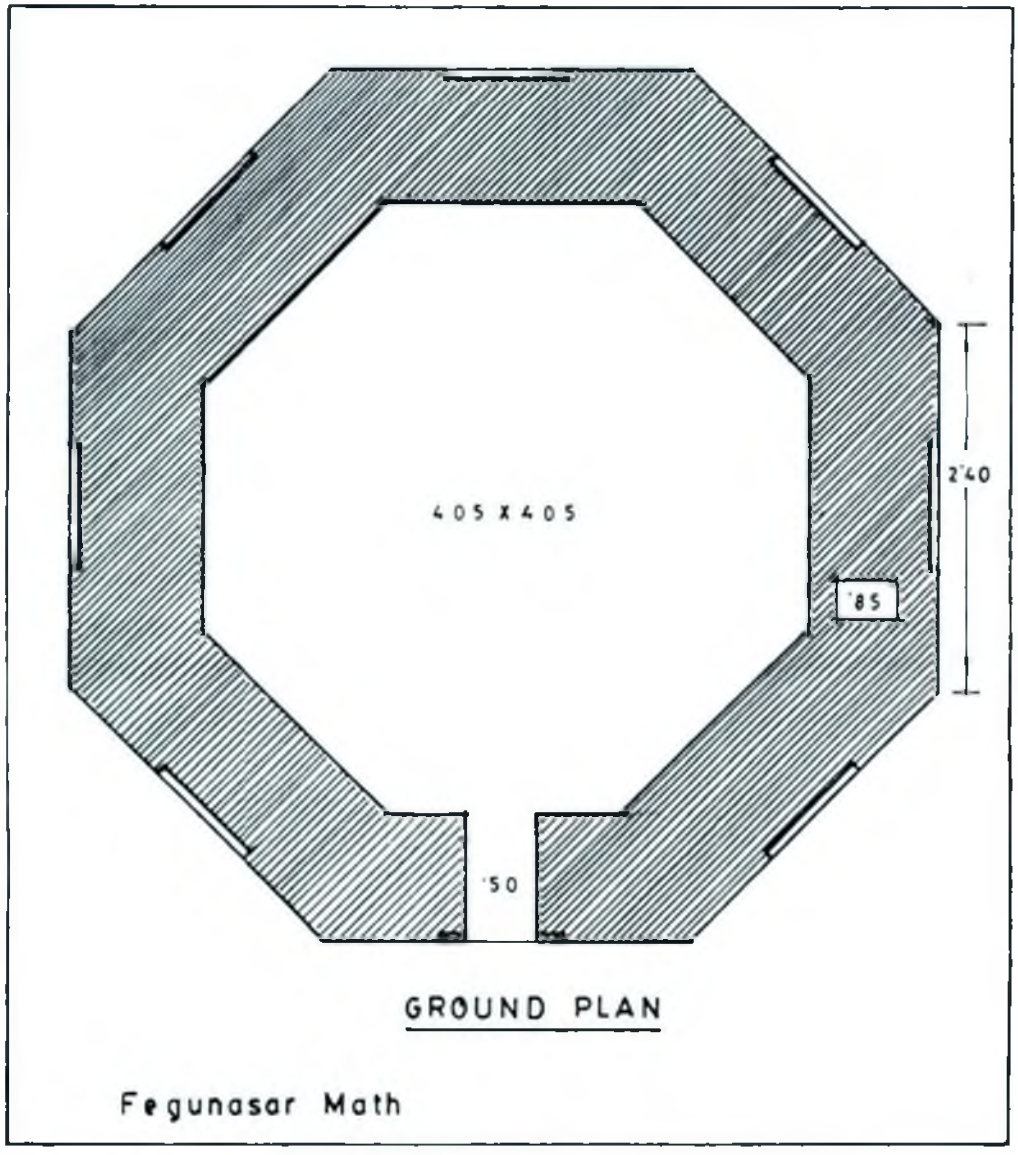

ভূমিনকশা : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

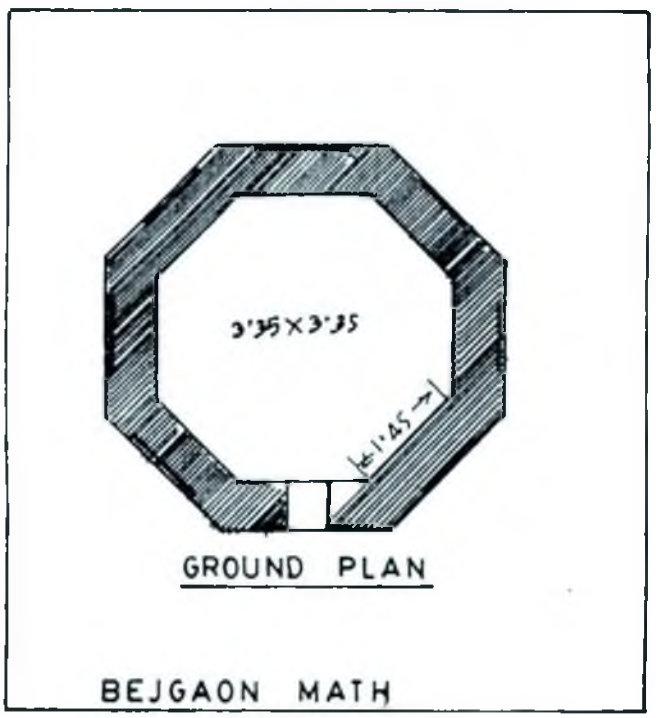

ভূমিনকশা : ১৪

Dhaka University Institutional Repository

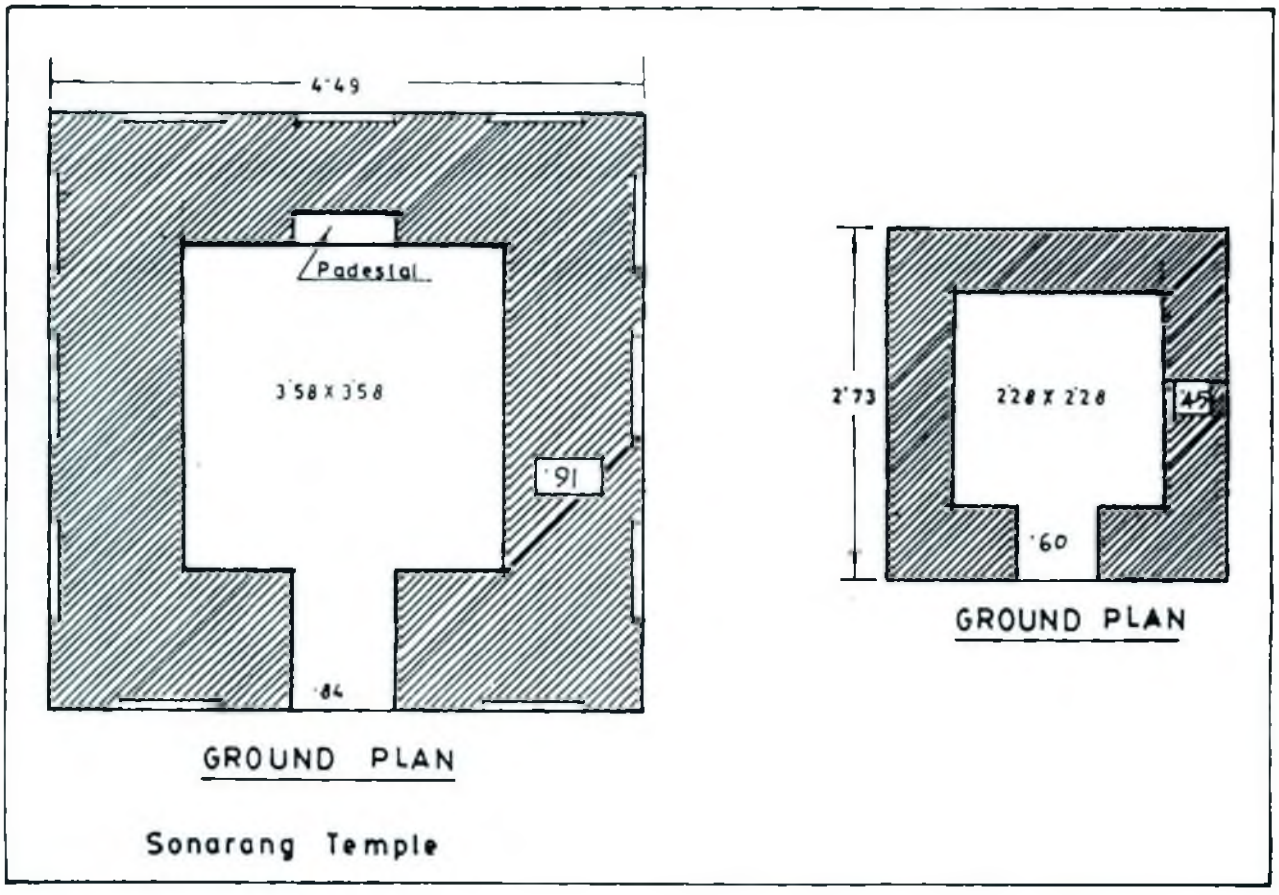

ভূমিনকশা : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

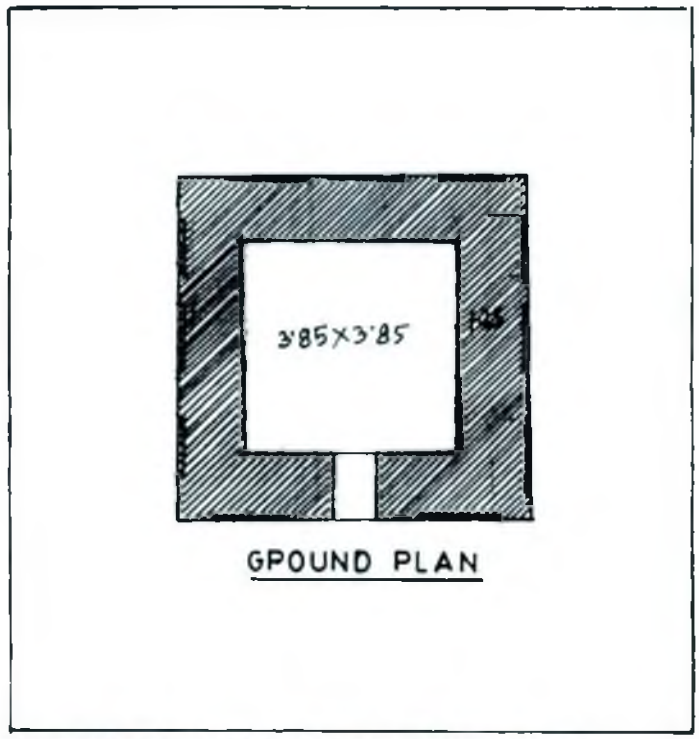

SHYAM SIDDHIR MATH, SRINAGAR.

ভূমিনকশা : ১৬

Dhaka University Institutional Repository

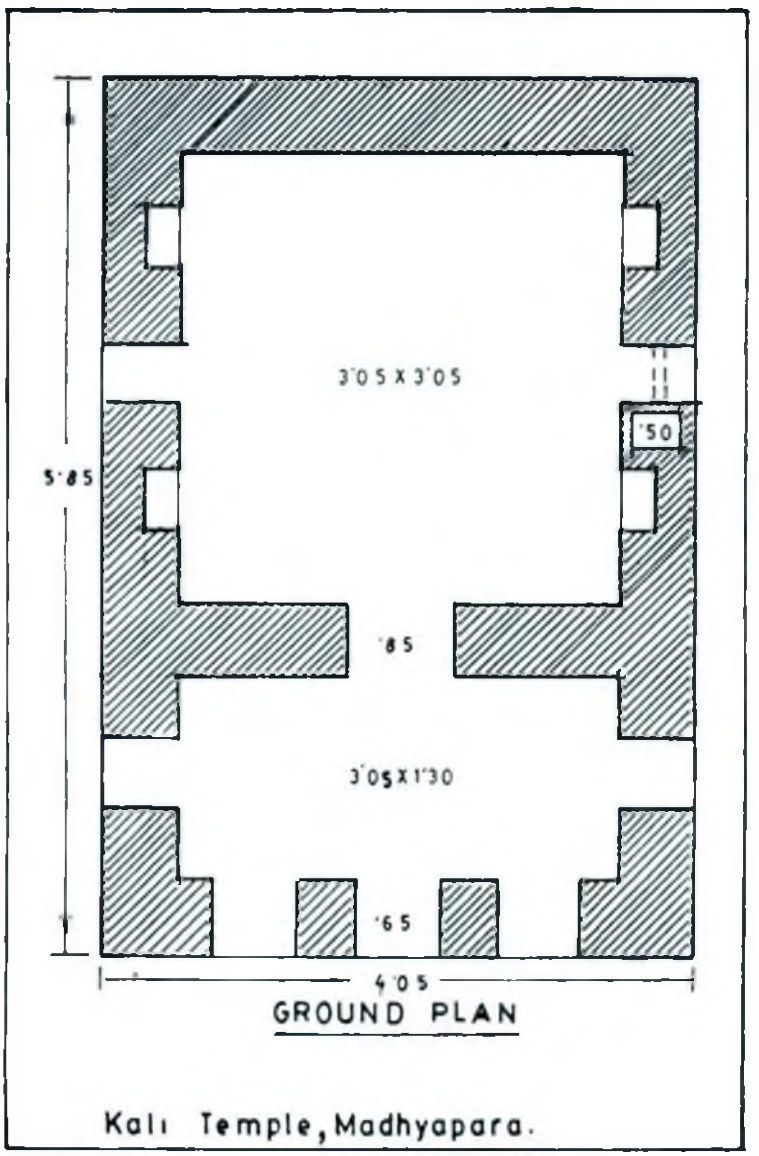

ভূমিনকশা : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

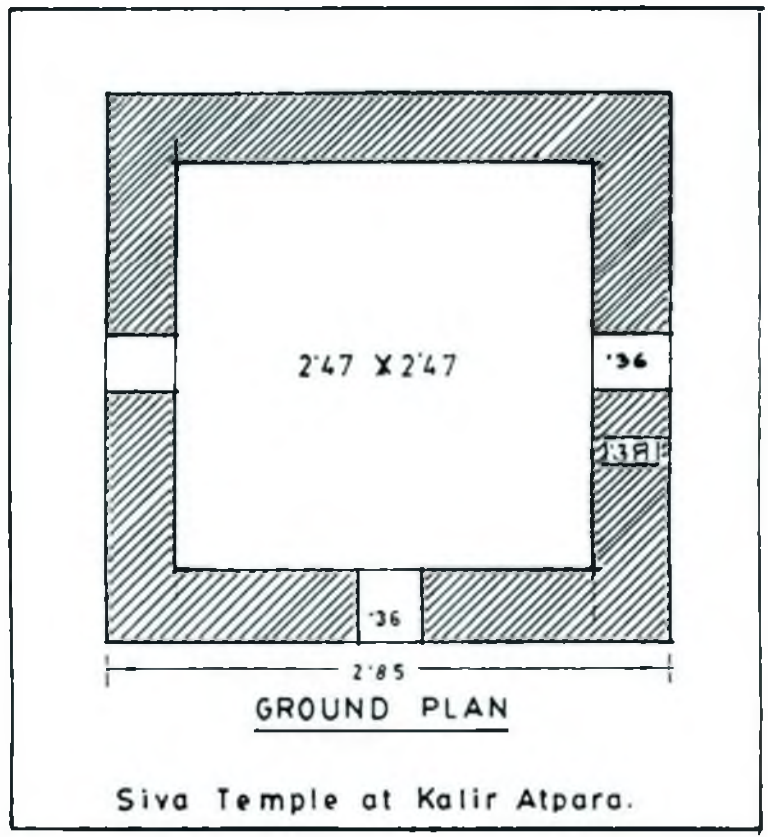

ভূমিনকশা : ১৮

Dhaka University Institutional Repository

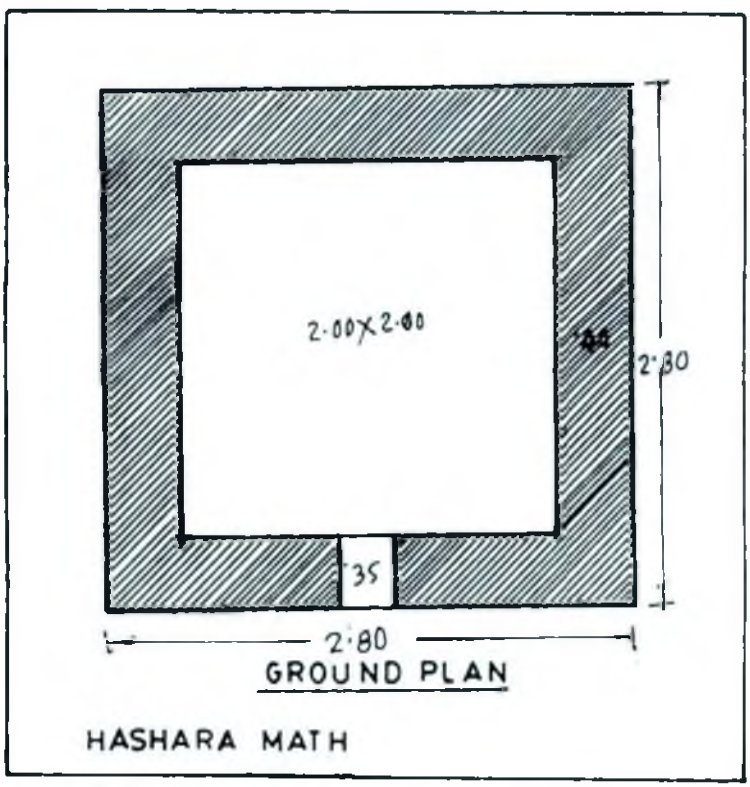

ভূমিনকশা : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

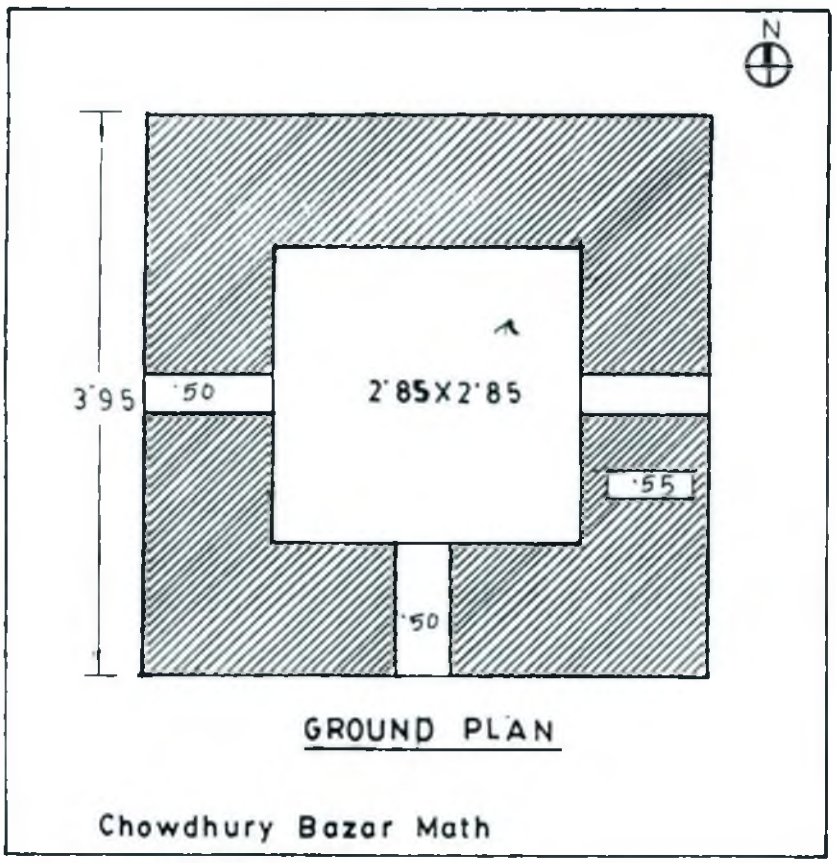

ভূমিনকশা : ২০

Dhaka University Institutional Repository

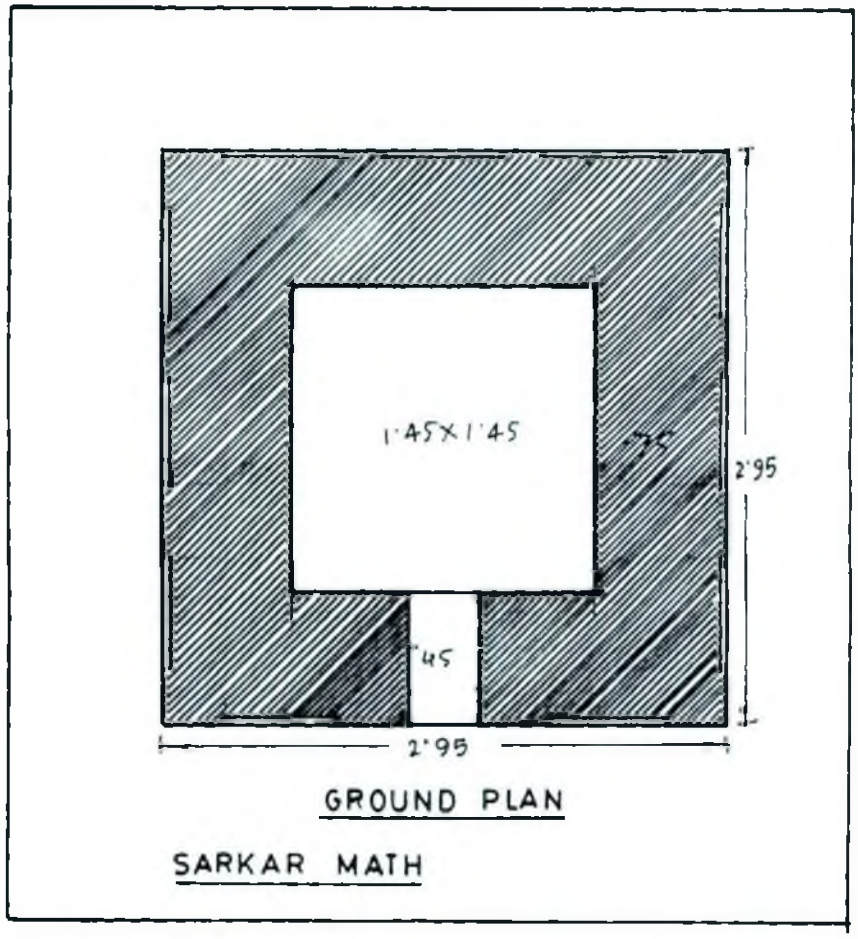

ভূমিনকশা : ২১

Dhaka University Institutional Repository

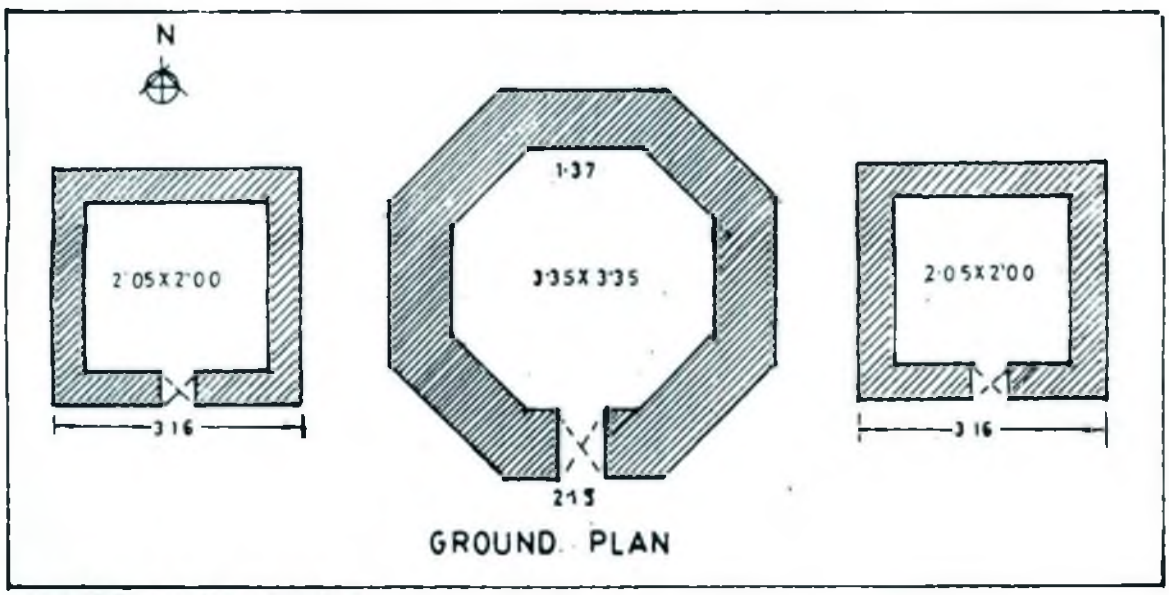

GROUND PLAN

MAIZE PARA MATH

ভূমিনকশা : ২২

Dhaka University Institutional Repository

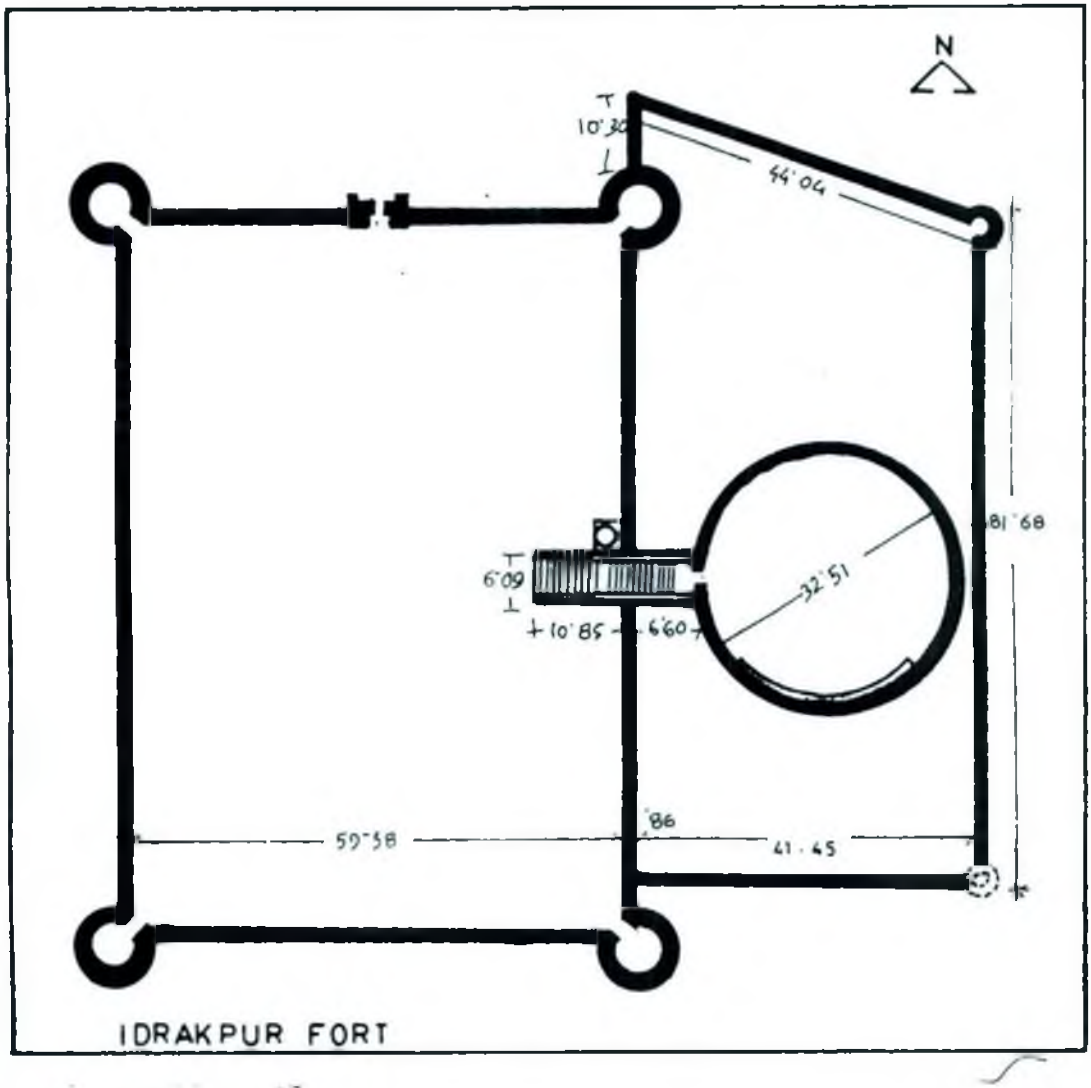

ভূমিনকশা : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

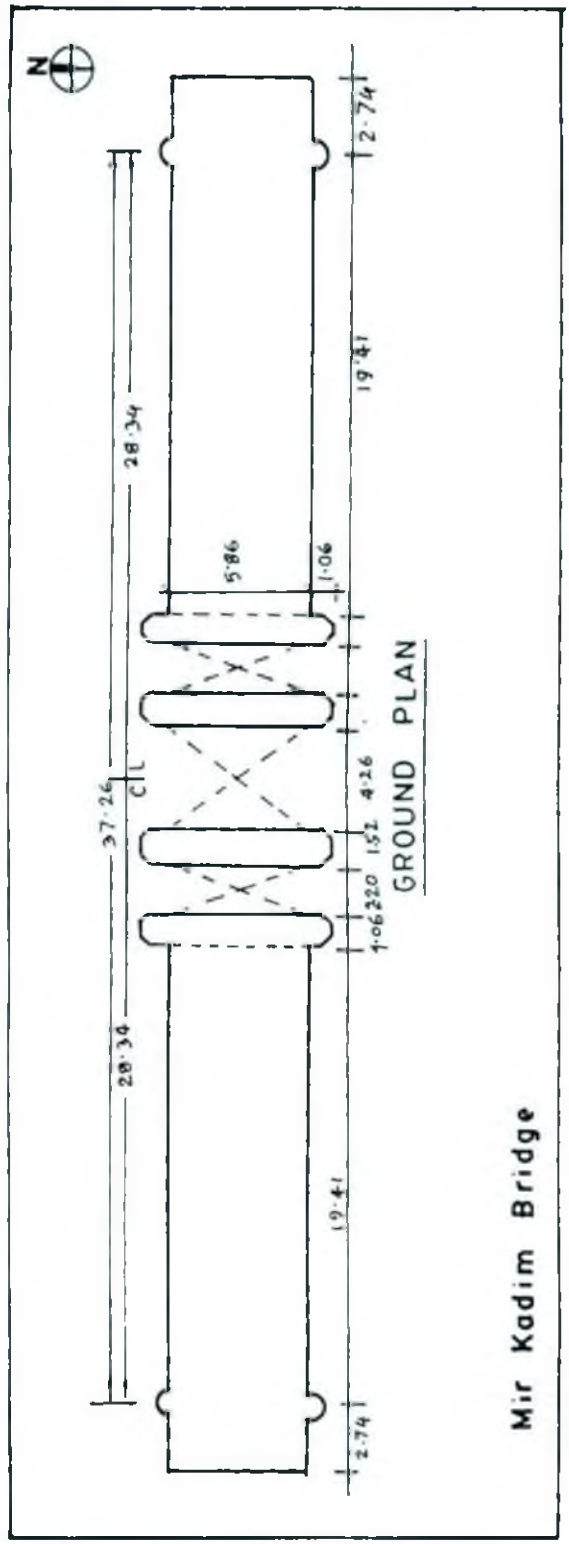

ভূমিনকশা : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ১, বাবা আদম মসজিদ, রামপাল, মুন্সিগঞ্জ।

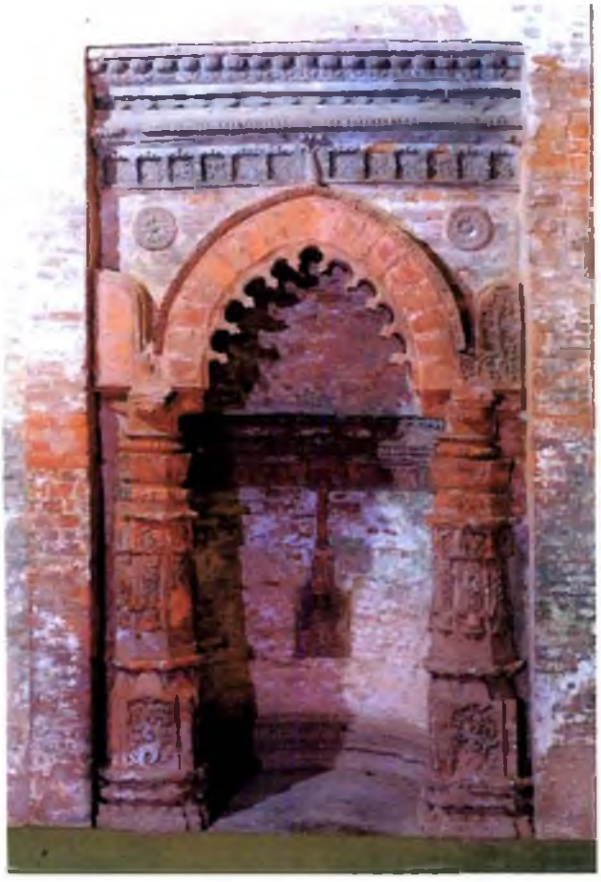

চিত্র ঃ ২, কেন্দ্রীয় মিহরাব বাবা আদম মসজিদ, রামপাল।

Dhaka University Institutional Repository

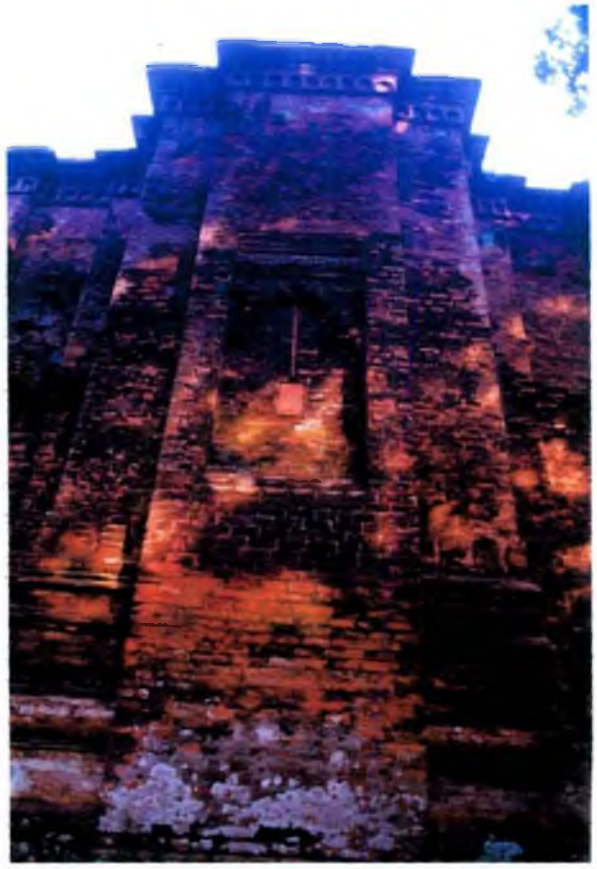

চিত্র ঃ ৩, পশ্চাৎ দেয়াল, বাবা আদম মসজিদ।

চিত্র ঃ ৪, অভ্যন্তরভাগ, বাবা আদম মসজিদ।

Dhaka University Institutional Repository

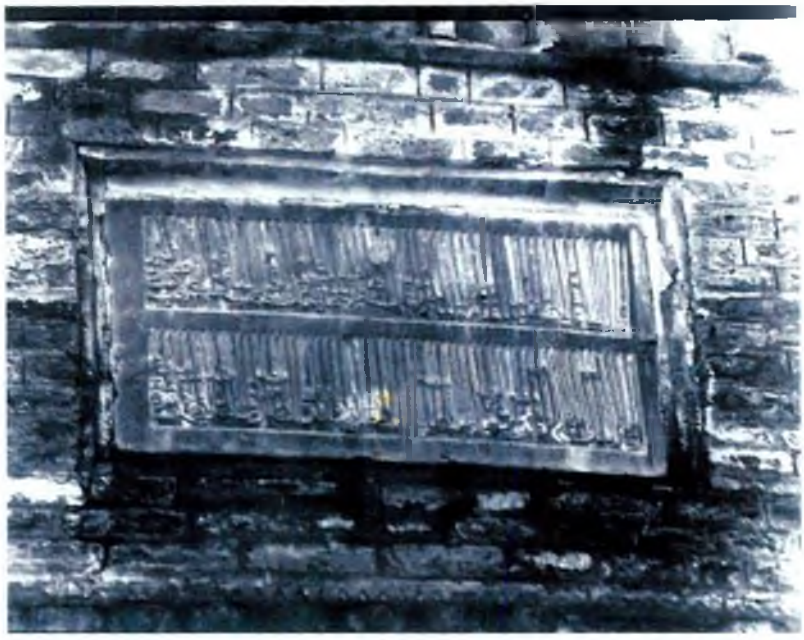

চিত্র ঃ ৫, শিলালিপি, বাবা আদম মসজিদ ।

চিত্র ঃ ৬, বার আউলিয়ার মাজার, কেওয়ার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ৭, বাংলা পেনডেনটিভ, রিকাবীবাজার মসজিদ, রিকাবীবাজার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ৮, গম্বুজ, রিকাবীবাজার মসজিদ, রিকাবীবাজার।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ৯, সম্মুখভাগ, কোটগাঁ শাহী মসজিদ, কোটগাঁ, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ১০, শাহী মসজিদের মৌচাক নকশা সংবলিত মসজিদের অবস্থান্তর পর্যায়ে স্কুইঞ্চ পদ্ধতি, শাহী মসজিদ , কোটগাঁ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ১১, পাথর ঘাটা মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথ, পাথরঘাটা, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ১২ বলালী মসজিদ, বলুই, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ১৩, আউটশাহী মসজিদ, আউটশাহী, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ১৪, বাঁশবাড়ী মসজিদ, বাঁশবাড়ী, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ১৫, মশুরীপাড়া জামে মসজিদ, মশুরীপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ১৬, কেন্দ্রীয় মিহরাব মশুরীপাড়া মসজিদ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ১৭, দক্ষিণ কাজীকসবা মসজিদ, কাজীকসবা, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ১৮, রাধাগোবিন্দ মন্দির, মূলচর, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ১৯, সম্মুখভাগ শিবমন্দির, ফেগুনসার, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ২০, শিবলিঙ্গ, শিবমন্দির, ফেগুনসার।

চিত্র ঃ ২১, আউটশাহী মঠ, আউটশাহী, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ২২, ফেগুনসার মঠ, ফেগুনসার, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ২৩, সতীদাহ মঠ, বেজগাঁও, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ২৪, সোনারং মন্দির, সোনারং, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ২৫, শ্যামসিদ্ধির মঠ, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ২৬, কালীমন্দির মধ্যপাড়া, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ২৭, কালীর আটপাড়া মন্দির, আটপাড়া, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ২৮, হাঁসাড়া মঠ, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ২৯, চৌধুরী বাজার মঠ, চৌধুরী বাজার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ৩০, সরকার মঠ, তাজপুর, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ৩১, মাইজপাড়া মঠ, মাইজপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ৩২, সুউচ্চ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা বুরুজ, ইদ্রাকপুর জলদুর্গ, ইদ্রাকপুর, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্র ঃ ৩৩, সম্মুখভাগ ইদ্রাকপুর দুর্গ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ ৩৪, মীরকাদিম সেতু, মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রতিবেদনে বিক্রমপুর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু-নিদর্শন নেই ?

২। বিক্রমপুর নগরী এবং 'বিক্রমপুর' নামটির উদ্ভব এক ও অভিন্ন নয় — এ বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত আলোচনায়।

৩। পৃ: ১৭: শ্রীচন্দ্রদেবের ৬ষ্ঠ রাজ্য বর্ষে তাম্র লেখমালার অভিলেখ হবে, ??

৪। পৃ: ২২: সমুদ্রগুপ্তের সময় বিক্রমপুর গুপ্ত সাম্রাজ্যের কতটুকু এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ?
সমতটের কতটুকু এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৫। পৃ: ৪২: মুসলমান শাসন শুরুর প্রাক্কালে হিন্দুদের ধার্মিক নিদর্শনাদির প্রভাব মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শনাদিতে কতখানি পড়েছে ?
মুসলমান শাসনের প্রাক্কালে স্থাপত্য নিদর্শনাদির প্রভাব ছিল কি ? বিস্তারিত লিখুন।